ভালোবাসার
চাদর
sean
PUBLICATION

ভালোবাসার চাদর

ড. বিলাল ফিলিপস
মুস্তাফা আল-জিবালী

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

ভেতরের পাতায়

সূচনাকথা

চৌধুরী সাহেব। কল্পিত চরিত্র নয়; বাস্তব দুনিয়ার রক্তমাংসে গড়া জীবিত মানুষ। দেখতে শুনতে প্রচলিত অর্থে নিপাট ভদ্রলোক। সুঠাম দেহের অধিকারী। আমি আর সে এক সময় কিছু দিন একই এলাকায় বসবাস করেছি। রাস্তা-ঘাটে চলতে ফিরতে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া থেকেই পরিচয়। সে কীভাবে যেন জেনেছে, আমি লেখালেখির সাথে জড়িত। সেই থেকে আমার সাথে তার বেশ খাতির-যত্ন। বেশ অনেক বছর ওপার বাংলায় বসবাসের সুবাদে লেখকশ্রেণির লোকদের প্রতি তার বিশেষ সমীহবোধ জন্মেছে।

আমাকে দেখলেই অশুদ্ধ উচ্চারণে সালাম দিত, বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য টানাটানি করত। না পারলে রাস্তায় দাঁড়িয়েই কথাবার্তা শুরু করত। এভাবে আজ একটু কাল একটু শুনতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম: সাধারণ গোছের লোক হলেও সে আমার জন্য ক্ষুদ্র পরিসরে একজন অসাধারণ কালের সাক্ষী। তার অভিজ্ঞতার ঝুলি এমন অন্ধকার জগতের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, যে জগতের পর্দা উঠানো আমার নিজের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। তাই আমি নিজেও কিছু সময় বের করলাম তার সাথে গল্প করার মধ্য দিয়ে কিছু জানতে, কিছু বুঝতে।

আজ এই দাম্পত্য-জীবন-সংক্রান্ত বইয়ের সূচনাকথা লিখতে গিয়ে তার নিজের জীবন থেকে নেওয়া একটি অভিজ্ঞতা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ণনাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ও একেবারেই প্রাসঙ্গিক পরিসরের মধ্যে রেখে যতটুকু বলা যায় তার চেয়ে এক চুলও বাইরে যাব না। কারণ,, খারাপের প্রতি নাফসের সহজাত ঝোঁক থাকে এবং তার প্রতি সে সহজেই আকৃষ্ট হয়। তাই স্থান-কাল-পাত্রের উল্লেখ যথাসম্ভব উহ্য রাখব। এ কারণে কোথাও বর্ণনাকে খুব দ্রুতগতির মনে হতে পারে। এটা ইচ্ছাকৃত।

একবার তিনি বাইরের কোনো একটি দেশে যান বেড়াতে। সেখানে তিনি এক রাতের জন্য একটি হোটেলে একজন শয্যাসঙ্গিনীসহ রুম বুকিং দেন। চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে তিনি সন্ধ্যায় সেখানে যাবেন এবং পরদিন দুপুর পর্যন্ত তাকে নিয়ে থাকবেন।

যেদিন সেখানে তার রাত্রীযাপনের কথা সেদিন দুপুরে অচেনা নাম্বার থেকে একটি ফোন এল—'কেমন আছ?'

প্রশ্নের ধরন এমন যেন কতকালের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। বলল, 'দুপুরে খেয়েছ?'

এরপর ফোনে যত রকম মনভোলানো কথা বলা যায় তার কোনোটাই বাদ গেল না। এরই মধ্য দিয়ে সে নারী তার রুচিবোধ, পছন্দ-অপছন্দ, আগ্রহের বিষয় ইত্যাদির যতখানি সম্ভব খোঁজ নিয়ে নিল।

নির্দিষ্ট দিনে তিনি যখন সন্ধ্যায় গিয়ে সেখানে উপস্থিত হন তখন তার নির্ধারিত চেক-ইন টাইমের চেয়ে ঘণ্টা খানেক দেরি হয়ে গেছে।

রিসিপশন থেকে জানতে পারলেন, তার সঙ্গিনী তার জন্য রুমে অপেক্ষা করছে। তিনি রুমে গিয়ে নক করলেন। সত্যিই নীল চোখের অসাধারণ রূপবতী এক তরুণী ভেতর থেকে দরজা খুলে তাকে কোমল অভিবাদন জানাল; বয়স বাইশ তেইশের মতো হবে। পরক্ষণেই তাকে আশ্চর্য করে দিয়ে আলতো করে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রাখল এসে। বলল: 'তোমাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে, নিশ্চয়ই বাইরে অনেক কাজ ছিল; তাই বোধ হয় দেরি হয়ে গেছে।'

সে তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসাল, এক গ্লাস পানি এনে দিলো। তারপর নিজ হাতে তার জুতো-মোজা খুলে দিলো। শার্টের বোতাম খুলে দিলো এবং বোতাম খোলার সময় বুকে একটা চুমুও এঁকে দিলো।

মেয়েটি ফোনালাপে জেনে নিয়েছিল চৌধুরী কেমন পোশাক পছন্দ করে—ভারতীয় নারীদের মতো শাড়িতে, না কি ইউরোপিয়ানদের মতো জিন্স টি-শার্টে। সে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে নিজেকে তার পছন্দের সাজে সাজাতে।

ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে চৌধুরী দেখল হাতে একটি তোয়ালে আর একটি টি-শার্ট নিয়ে মেয়েটি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। টি-টেবিলে হালকা নাস্তা, ফল আর কফি। বলল, সে কেবল তাকে আপ্যায়নের জন্য এই নাস্তা নিজে বানিয়েছে। তোয়ালে দিয়ে মাথা ভালো করে মুছে দিয়ে গেঞ্জিটি গায়ে পরিয়ে দিলো।

এরপর নাস্তা খাইয়ে দিলো নিজ হাতে আদরের সাথে যত্ন করে। ফলটা কাটল। একটি একটি করে টুকরো তাকে খাইয়ে দিলো। চৌধুরী খেয়াল করে দেখল:

প্রত্যেকটি টুকরো কেটে সে তাকে আগে এক কামড় খাইয়েছে, তারপর বাকি অংশটুকু নিজে খেয়েছে। ভুলেও সে নিজে কোনো টুকরোয় আগে কামড় দেয়নি। চা পান করে তারপর বিছানায় গেল। তার মাথাটা পরম যত্নে বুকে নিয়ে শুল, তারপর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকল আলতো করে। আর তার সাথে তারই আগ্রহের নানা বিষয় নিয়ে গল্প করতে শুরু করল। সযত্নে খেয়াল রাখল কোনো বিষয়ে কথা বলতে সে উৎসাহবোধ করে, আনন্দ পায়। কোনো বিষয়ে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করল না; তর্ক করল না; বরং সম্ভব হলে তার কথাকে সমর্থন করে কিছু যুক্ত করল। সে নিজে বেশি কথা বলেনি, বরং সে ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন আগ্রহী ও আদর্শ শ্রোতা: যার সাথে মন খুলে কথা বলা যায়, কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়।

তার বলা যেসব কথা চৌধুরী আমাকে শুনিয়েছিল তার মধ্যে আমার একটি কথা বিশেষভাবে মনে আছে। সে বলেছিল: 'গাছ যেমন মানুষের ছাড়া বিষাক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নেয় আর অক্সিজেন নির্গত করে মানুষকে সজীবতা দেয়, সৃষ্টি জগতে নারী হলো পুরুষের জন্য তেমনই। বাইরের কঠোর-কঠিন জগতে কাজ করতে করতে পুরুষ ক্লান্ত হয়ে যখন নারীর কাছে আসবে, তখন সে তার সকল ক্লান্তি-শ্রান্তি শুষে নিয়ে তাকে আবার সম্পূর্ণ সজীব ও সতেজ করে দেবে। তুমি আমার কাছে এক রাতের জন্যই হয়তো এসেছ; আর কখনো আসবে কি না জানি না; আমি চাই আজকের রাতের পূর্বে তোমার শরীরে জমা সকল ক্লান্তি, মনের সকল শ্রান্তি আমি দূর করে তোমাকে সম্পূর্ণ সতেজ ও সজীব করে দেবো—এতেই আমার সার্থকতা।"

কথাগুলো আমার নিজের ভাষাতে লিখছি, তবেই মোটেই রং চড়িয়ে নয়। চৌধুরীর মনোহরণের জন্য সেই নারীর কৃত ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা থেকে যতটুকু মনে আছে এবং তুলে ধরার যোগ্য আমি কেবল ততটুকুই লিখলাম। তবে এটা কেবল টিপ অব অ্যান আইসবার্গ।

আমি চৌধুরীর এই ঘটনার বর্ণনা শোনার পর কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করলাম, ওরা তো নিছক দেহপসারিণী, ওদের সম্পর্কে বরং উল্টো অনেক জনশ্রুতি রয়েছে; কিন্তু সে আপনার সাথে এমন মনোহরা আচরণ কেন করল?

চৌধুরী আমাকে বলল, তার এমন ধরনের অভিজ্ঞতা একবার নয় একাধিকবার হয়েছে। এবং সে নিজেও এ বিষয়ে জানতে চেষ্টা করেছে। সে যা জানতে পেরেছে তার সারমর্ম হলো: দেহব্যবসার এই পেশার পেছনে বর্তমান দুনিয়ার অনেক বড় বড় ধনাঢ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের গোপন বিনিয়োগ আছে। তারা পতিতাদেরকে নানা রকম

প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে। তাদের এই ব্যবসায় তাদের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হলো পরিবার ব্যবস্থা ও সুখী দাম্পত্য-জীবন। কোনো মানুষ যদি সুখী দাম্পত্য-জীবন যাপন করে তা হলে তাকে তাদের খদ্দের বানানো যায় না সহজে। পক্ষান্তরে মানুষের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি সৃষ্টি, কিংবা মানুষের চরিত্র নষ্ট করতে পারলে সহজেই তাদেরকে তাদের খদ্দের বানানো যায়। আর এ লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য তাদের বিভিন্ন রকম প্রোগ্রাম রয়েছে।

আর পতিতাদেরকে এমন অনুগত ও মনোহরা স্ত্রীসুলভ আচরণের শিক্ষা দেওয়া হয় নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে; যেন স্ত্রীদের বিপরীতে একজন পুরুষ এদের কাছে এসেই অধিক প্রশান্তি লাভ করে। গবেষণা থেকে তাদের কাছে এটা প্রমাণিত হয়েছে, পুরুষকে কেবল শারীরিক সুখ দিয়ে সত্যিকার অর্থে আকৃষ্ট করা যায় না; এটা ক্ষণিকের। তাদেরকে নিয়মিত খদ্দের বানাতে হলে তাদের হৃদয়-মনে শান্তির পরশ দিয়ে তাদেরকে পাগল করে দিতে হবে। যেন তার মন ঘরে নয়, এখানেই পড়ে থাকে—যেন বার বার ফিরে আসে।

২.

শেষ জামানায় ঈমান অক্ষুণ্ণ রাখা হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে থাকার মতো কেন হবে তার আরও একটি কারণ, যেন আমার কাছে উন্মোচিত হলো চৌধুরীর কথা শুনে।

দেহব্যবসার ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। বর্তমান ও অতীতের অনেক জাতির মধ্যেই এই ঘৃণ্য কর্মের চর্চা ছিল এবং আছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর এই ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সভ্যতা এতে যে-পেশাদারিত্ব যুক্ত করেছে তা অতীতের কোনো যুগে ছিল বলে আমার জানা নেই।

অর্থের বিনিময়ে ক্ষণিকের সঙ্গী হিসেবে আসা একজন কাস্টমারের সাথে কৃত আচরণকে দাম্পত্য-জীবনের স্থায়ী সঙ্গীর সাথে মেলানোর কোনো অবকাশ নেই। কারণ, দাম্পত্য সম্পর্ক ক্ষণিকের জন্য কারও শয্যাসঙ্গী হওয়া নয়—সেখানে সব সময় মুখে কৃত্রিম হাসি লাগিয়ে রাখা যায় না, 'কাস্টমার ইজ অলওয়েজ রাইট' বলা যায় না। এখানে স্বামী-স্ত্রীরা দীর্ঘ দিন একত্রে বসবাস করেন। বাস্তব জীবনের নানা রকম সুবিধা-অসুবিধা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, পরিবার-পারিবারিকতা, অর্থ-আর্থিকতা, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা, সমাজ-সামাজিকতা, নিত্যদিনের অভ্যাস-আচরণের বিচিত্র মিল-অমিলসহ নানারকম টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে সংসার জীবন যাপন করেন তারা। প্রায় ভিন্ন প্রকৃতির দুজন মানুষকে এভাবে দীর্ঘ দিন মানিয়ে চলাটাই বরং

এখানে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তাই দাম্পত্য-জীবনের প্রতিটি দিন, প্রতিটি সন্ধ্যা মধুময় না-ও হতে পারে।

তবে হ্যাঁ, বিপরীত প্রান্তে এটাও ধ্রুব সত্য, তিক্ততা যদি মধুরতার উপর জয়লাভ করে, ভালোলাগার উপর যদি বিরক্তি প্রাধান্য বিস্তার করে, মিলের চেয়ে অমিল যদি বেশি হয়, মতৈক্যের চেয়ে দ্বিমত যদি মাত্রা ছাড়ায়, আকর্ষণের চেয়ে অনীহা যদি প্রবল হয় তবে দাম্পত্য-সুখ বিদায় জানাবে; হয়তো ভাঙনও অনিবার্য হয়ে পড়বে। সেক্ষেত্রে কেবল সন্তানের নোঙরই যদি দুজনকে এক ঘাটে বেঁধে রাখে, তাতে জীবন হয়ত কেটে যাবে, কিন্তু তাতে রং থাকবে না।

দাম্পত্য জীবনে যে এমন মনোহরী আচরণের প্রয়োজন নেই তা নয়, বরং আরও বেশি প্রয়োজন। এখানেও প্রয়োজন মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে একের সাথে অন্যের পার্থক্য ও চাহিদাকে সম্মানের সাথে মূল্যায়ন করা। এখানেও থাকতে হবে নিজের গল্প বলার চেয়ে অন্যের গল্প শোনার অধিক আগ্রহ। একে অন্যের ভুলত্রুটি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা; কষ্ট ভুলে গিয়ে মুখে হাসির দ্যুতি ছড়ানো। দুঃখ-বেদনার উপর ধৈর্যের শক্ত প্রলেপ দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করা। অপ্রাপ্তির খাতা বন্ধ রেখে প্রাপ্তির ফর্দ প্রস্তুত করা। পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো, পরস্পরকে সুখী ও খুশি করতে নিজের চাওয়ার উপর অন্যের চাওয়াকে গুরুত্ব দেওয়া। সর্বোপরি প্রয়োজন উভয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দকে উভয়ের স্রষ্টা মহান আল্লাহর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করা।

দেহপসারিণীদের বিপরীতে আজ পরিবারকে ধরে রাখা এক বড় রকম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে—বিশেষত অমুসলিম এবং নামকাওয়াস্তে মুসলিম দম্পতিদের জন্য। মূল ভিত্তিগুলো নড়বড়ে হলেও একটা সময়ে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও নৈতিকতার একটা মাত্রা ছিল। কিন্তু বস্তুবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার ভাটার টানে সে ঠুনকো নৈতিকতার পলি তলায় জমার আগেই ভেসে গেছে। একমাত্র প্র্যাকটিসিং মুসলিমদের স্ত্রী ছাড়া কমবেশি সকলকেই আজ যেন প্রশিক্ষিত ও পেশাদার বারাঙ্গনাদের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে সংসার টিকিয়ে রাখতে।

তবে তার অর্থ এই নয় যে প্র্যাক্টিসিং মুসলিমদের জন্য সংসার-সুখ বজায় রাখার জন্য কোনো নির্দেশনা প্রয়োজন নেই। মানুষ যতই ধার্মিক হোক না কেন, যে সমাজে সে বাস করে তার প্রভাব থেকে সে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে কখনোই পারবে না। সচেতন মুসলিমদের দাম্পত্যজীবনেও আজ অশান্তি তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে। 'ভালোবাসার চাদর' শিরোনামের এই বইটি মূলত তাদেরই জন্য।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজ এই জাতির পুরুষরা যেমন পৌরুষ হারিয়েছে—সাহসিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ও দায়িত্বশীলতার সংমিশ্রণে সৃষ্ট চারিত্রিক দৃঢ়তা খুইয়েছে; তেমনি নারীরাও হারিয়েছে তাদের নারীসুলভ বিনম্রতা, আনুগত্যপরায়ণতা ও মমত্ববোধের সংমিশ্রণে তৈরি চারিত্রিক সুষমা।

স্বামী তার স্ত্রীদের প্রতি কতটা ন্যায়পরায়ণ, কতটা দায়িত্বশীল, কতটা যত্নবান হতে পারেন তার অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে আমাদের মুসলিমদের ইতিহাসে। স্বয়ং আল্লাহর নবি মুহাম্মাদ ﷺ তার স্ত্রীকে উটে চড়তে সাহায্য করার জন্য হাঁটু গেড়ে বসেছেন যেন স্ত্রী তার হাঁটুকে সিঁড়ির মতো ব্যবহার করে উটে আরোহণ করতে পারেন।

অন্যদিকে স্বামীর প্রশান্তির জন্য একজন স্ত্রী কতটা চিন্তিত হতে পারে তা দেখতে পাই অসংখ্য নারী সাহাবীদের জীবনে। তেমনই একজন ছিলেন উম্মু সুলাইম (রা.)। তিনি তখন ছিলেন আবু ত্বালহা (রা.)-এর স্ত্রী। তাদের ছিল একটিমাত্র ছেলে। আবু ত্বালহা তাকে খুব ভালোবাসতেন। কিন্তু একসময় ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ে, বেশ অসুস্থ। আবু ত্বালহা সাধারণত ফজরের সময় চলে যেতেন সালাতে, এরপর আল্লাহর রাসূলের সাথে থাকতেন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত। এরপর এসে খেয়ে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে আবার চলে যেতেন এবং আসতেন ‘ইশার সালাতের পর।

ছেলের অসুস্থতার সময়ে একদিন সকালে আবু ত্বালহা মাসজিদে কিংবা আল্লাহর রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করতে চলে যান এবং একবারে রাতে ফিরে আসেন; আবার সাথে ক'জন মেহমানও নিয়ে আসেন। তার অনুপস্থিতির এই সময়েই তার আদরের ছেলেটি মারা যায়। তার স্ত্রী উম্মু সুলাইম ছেলেকে এমনভাবে আবৃত করে তার ঘরে রেখে দেন, যেন সে আরামে ঘুমুচ্ছে। অন্য সকলকে অনুরোধ জানান, তিনি নিজে না বলা পর্যন্ত কেউ যেন তার স্বামীকে তার ছেলের মৃত্যুসংবাদ না জানায়।

রাতে আবু ত্বালহা এসে জিজ্ঞেস করেন, ‘ছেলেটা কেমন আছে আজ?’

তিনি বলেন, ‘অসুখ হওয়ার পর থেকে আজকের মতো শান্ত সে আর কোনো দিন ছিল না; সে এখন বেশ আরামেই আছে।’

উম্মু সুলাইম সবার জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থা করেন। মেহমানরা খাবার খেয়ে চলে গেলে আবু ত্বালহা বিছানায় যান। উম্মু সুলাইম গায়ে সুগন্ধি লাগান এবং স্বামীর জন্য এমন সুন্দরভাবে নিজেকে সাজান যেভাবে কখনো ইতিপূর্বে সাজেননি। তারপর তিনি বিছানায় যান এবং স্বামীর সাথে এক মধুময় রাত্রি যাপন করেন।

এরপর যখন রাত শেষ হয়ে আসে, তখন তিনি স্বামী আবু ত্বালহাকে বলেন, 'আচ্ছা কেউ যদি কারও কাছে কোনো আমানত রেখে তা আবার ফেরত চায়, তা হলে তার কি কোনো অধিকার আছে তা ফেরত না দেওয়ার?'

'অবশ্যই না।'

'মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ আপনাকে একটি পুত্রসন্তান দিয়েছিলেন আমানত হিসেবে; এখন তিনি তার আমানত ফেরত নিয়ে গেছেন। অতএব ধৈর্যধারণের মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে এর প্রতিদান কামনা করুন।'

নিশিভোরে আবু ত্বালহা গোসল করে পবিত্র হয়ে আল্লাহর রাসূলের কাছে যান এবং তার সাথে সালাত আদায় করেন। তারপর তিনি তাঁকে গতরাতের সব ঘটনা বলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সব শুনে এই দম্পতির জন্য দু'আ করে বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের গতরাতের মধ্যে বারাকাহ দান করুন।"

সেই রাতেই উম্মু সুলাইম (রা.) আবার গর্ভবতী হয়ে পড়েন।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে এমন দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই খুব বেখাপ্পা মনে হতে পারে আমাদের অনেকের কাছে। কিন্তু সুখের নিঁশ্চয়তা এখানেই। আমরা যতই চেষ্টা করি, যতই পরিশ্রম করি, আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত সুখী দাম্পত্য-জীবনের নিশ্চয়তা পাব না যতক্ষণ আমাদের দাম্পত্যসম্পর্ককে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম না বানাব, যতক্ষণ না আমাদের হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা ও সুখ দুঃখের মূল অনুষঙ্গ হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন কিংবা তার রোষানল থেকে বাঁচার তামান্না।

বিয়ে ছাড়াও পৃথিবীতে আজ লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ একসাথে থাকছে—নাম দিয়েছে লিভ টুগেদার, ট্রায়াল ম্যারেজ—আরও কত কী। শার'ঈ নিয়মে সম্পাদিত আমাদের বিয়ে ও তাদের লিভ টুগেদারের মধ্যে সত্যিকার পার্থক্যরেখা স্পষ্ট হবে তখনই, যখন আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করা পবিত্র বন্ধন পরিচালিত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আমাদের প্রতিটি কথা, আচরণ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা এবং অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য নিয়ে। সবার জন্য এই কামনাই রইল।

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
প্রধান সম্পাদক
সিয়ান পাবলিকেশন

কল্যাণময় বন্ধন

মহান আল্লাহ আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এই পৃথিবী কীভাবে চলবে তার বিধানও তিনি দান করেছেন। তাঁর নির্ধারিত নিয়মেই বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খাওয়ার প্রয়োজন হয়; নিশ্বাস নিতে বাতাসের প্রয়োজন হয়; গাছপালার জন্য বৃষ্টির প্রয়োজন হয়; এমন আরও অজস্র বিধান। সকল কিছুর জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি হওয়া আল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহের অন্যতম। এ সকল জোড়া থেকেই বয়ে চলেছে সৃষ্টির আবহমান স্রোতধারা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

« আমি সকল জিনিস জোড়ায়-জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা হৃদয়ঙ্গম করো।[১] »

একইভাবে মানবজাতির মাঝেও রয়েছে একটি জুটি—নর ও নারী। আমাদের পিতা আদম এবং মাতা হাওয়ার মাধ্যমেই শুরু হয়েছে মানবজাতির ক্রমবিকাশ। এই যুগল থেকেই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীর পরবর্তী সকল মানুষকে। তিনি বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾

« হে মানবমণ্ডলী, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা হতে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন।[২] »

ইসলামী শারী'আতের বই-পুস্তকে বিবাহ বোঝাতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয় তা হলো, 'নিকাহ্'। আরবি ভাষার প্রাচীন প্রয়োগ অনুযায়ী এর অর্থ হলো 'দৈহিক মিলন'।

---

[১] সূরা আদ্-দারিয়াত ৫১:৪৯।

[২] সূরা আন-নিসা ৪:১।

কিন্তু সেই সময় বিয়ের চুক্তিকে বোঝানোর জন্য ওই শব্দটিই ব্যবহৃত হতো। কারণ, বিয়ের মধ্য দিয়েই দৈহিক মিলনের বিষয়টি বৈধ হতো।[৩]

আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে বিয়ে করার জন্য এবং তারা যাতে তাদের অধীনস্থদের বিয়ে করার ক্ষেত্রে সাহায্য করে, সে জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

« তোমাদের মধ্যে যারা বিয়েহীন, তাদের বিয়ে সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন; আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।[৪] »

রাসূল ﷺ নিজেও যুবকদেরকে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং যুবকদের মধ্যে যারা বিয়ের ভরণ-পোষণ নির্বাহ করতে অসমর্থ তাদেরকে তিনি সিয়াম পালন করার উপদেশ দিয়েছেন, যাতে তারা নিজেদের যৌন চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ হয়। ইবনে মাস'ঊদ ؓ বর্ণনা করেন, আমরা যুবক অবস্থায় একদিন রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম এবং আমাদের সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। তাই রাসূল ﷺ বললেন:

﴿ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ ﴾

« হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে; কেননা তা চক্ষুকে অবনত করে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। আর যে এর সামর্থ্য রাখে না, তার কর্তব্য সিয়াম পালন করা; কেননা তা যৌন উত্তেজনার প্রশমন ঘটায়।[৫] »

আজকাল মুসলিম সমাজেও অবিবাহিত নর-নারীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে গেছে। এর পরিণতি হতে পারে খুব ভয়াবহ।

---

[৩] লিসানুল 'আরাব।

[৪] সূরা আন-নূর ২৪:৩২।

[৫] আল-বুখারি, খণ্ড ৭, অধ্যায় ৬৭, হাদীস নং ৫০৬৬, পৃষ্ঠা ২১; মুসলিম, খণ্ড ৪, অধ্যায় ১৬, হাদীস নং ৩৩৯৮, পৃষ্ঠা ১৫; জামে' আত-তিরমিযি, খণ্ড ২, অধ্যায় ৯, হাদীস নং ১০৮১, পৃষ্ঠা ৪৫২-৪৫৩; সুনান আবু দাউদ, খণ্ড ২, অধ্যায় ১২, হাদীস নং ২০৪৬, পৃষ্ঠা ৪৯৯; সুনান আন-নাসা'ঈ, খণ্ড ৪, অধ্যায় ২৬, হাদীস নং ৩২১১, পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯; সুনান ইবনু মাজাহ, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৯, হাদীস নং ১৮৪৫, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে কেউ অবিবাহিত থাকলে তা মুসলিম সমাজের জন্য কোনো হুমকি বলে মনে না-ও হতে পারে। তবে ইসলামে ব্যাপারটি তথাকথিত অন্যান্য ধর্মের চেয়ে একেবারেই আলাদা। ইসলামে প্রত্যেকটি বিষয়কে বিচার করা হয় কোনো একটি বিষয় সমগ্র সমাজের জন্য কতটা কল্যাণকর বা কতটা ক্ষতিকর তার আলোকে। তাই নারী-পুরুষ অবিবাহিত থাকলে মুসলিম সমাজের ওপর এর প্রভাব কতটা ক্ষতিকর তা বুঝতে চাইলে অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠীগুলোর দিকে তাকাতে হবে। আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছি কীভাবে যৌন বিকৃতি ও এ ধরনের নানাবিধ পাপাচার আমাদের সমাজে সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। এর সবকিছু আমাদের কাছে একেবারেই গা সওয়া হয়ে যাচ্ছে। আর এ সবকিছুর পেছনে মূল কারণ বিয়ে থেকে দূরে থাকার এক প্রকৃতিবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত।

নবিজি মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, বিয়ে করা তাঁর সুন্নাহ্ এবং তাঁর সুন্নাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে তিনি আমাদেরকে সাবধান করেছেন। যদিও তিনি সালাতেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ ও সন্তুষ্টি খুঁজে পেতেন, তবে পার্থিব যেসব উপভোগ্য ব্যাপার রয়েছে যেমন, স্ত্রীসঙ্গ বা সুগন্ধি—এসবের প্রতি তিনিও আকর্ষণ অনুভব করতেন। শুধু রক্ত-মাংসের তৈরি একজন রাসূলের ক্ষেত্রেই এমনটি হওয়া স্বাভাবিক। আনাস ؓ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

﴿ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ ﴾

« তোমাদের এ পার্থিব জগৎ হতে আমার নিকট নারী ও সুগন্ধি প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। আর সালাতের মধ্যে আমার চোখের শীতলতা রেখে দেওয়া হয়েছে।[৬] »

'আইশাহ (রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "বিয়ে আমার সুন্নাহ্। যে আমার সুন্নাহ্ মোতাবেক কাজ করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা বিয়ে করো। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করব। অতএব যার সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে। আর যার নাই সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা সিয়াম একে (জৈবিক চাহিদাকে) প্রশমিত করে।"[৭]

---

[৬] হাদীসটি আহমাদ, আন-নাসা'ঈ এবং অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। শায়েখ আল-আলবানি সহীহুল জামে', হাদীস ৩১২৪-এ হাদীসটিকে সহীহুল বলে মত দিয়েছেন।

[৭] সুনান ইবনু মাজাহ্, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৯, হাদীস নং ১৮৪৬, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯। শায়েখ আল-আলবানি আস-সহীহাহ, হাদীস ২৩৮৩-এ হাদীসটিকে সহীহুল বলে মত দিয়েছেন।

পূর্বেকার নবীদের কিছু অনুসারী আত্ম-পরিশুদ্ধির মাধ্যম হিসেবে সন্ন্যাসব্রতকে বেছে নিয়েছিল এই ভেবে, হয়তো তা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যলাভে সাহায্য করবে। কিন্তু দিন শেষে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, তারা যেমনটি আশা করছিল তেমনটি ঘটেনি। এর কারণ, খুবই স্পষ্ট। আর তা হলো এই ধরনের চর্চা মানবপ্রকৃতির বিরুদ্ধে যায়। এ কারণেই ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোনো স্থান নেই।

'আইশাহ (রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা) বর্ণনা করেন, সুলামি গোত্রের এক লোক হাকিম ইবনু উম্যাইয়্যাহ্ আস-সুলামির কন্যা খুওয়াইলাহ্ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। খুওয়াইলাহ্র বিয়ে হয়েছিল 'উসমান ইবনু মায'ঊনের সাথে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে দেখতে পেলেন এবং তার অপরিপাটি চেহারাও লক্ষ্য করলেন। তাই তিনি 'আইশাহকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে 'আইশাহ, খুওয়াইলাহ্কে এত মলিন এবং অপরিপাটি দেখাচ্ছে কেন?" 'আইশাহ (রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা) উত্তরে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, এই মহিলার স্বামী দিনের বেলা সিয়াম পালন করে আর রাতের বেলা সালাত আদায় করে; এমন যেন তার স্বামীই নেই। আর তাই সে তার নিজের ব্যাপারে যত্নশীল নয়।" অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ 'উসমান ইবনু মায'ঊনকে ডেকে পাঠালেন এবং তাকে বললেন, "হে 'উসমান, তুমি কি আমার সুন্নাহ্কে অপছন্দ করো বলেই এমনটি করছ?" সে উত্তর দিলো, "আল্লাহর কসম! সে জন্য নয়, হে আল্লাহর রাসূল, বরং আমার পুরো উদ্দেশ্যই হলো আপনার সুন্নাহ্র অনুসরণ করা।" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন:

> "নিশ্চয়ই আমি ঘুমাই এবং সালাত আদায় করি, কোনো দিন সিয়াম পালন করি আবার কোনো দিন করি না এবং নারীদেরকে বিয়ে-শাদী করি। কাজেই হে 'উসমান, আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যশীল হও। কারণ, তোমার ওপর তোমার পরিবারের, তোমার মেহমানের এবং তোমার নিজের (শরীরের) হক্ব রয়েছে। তাই (কোনো দিন) সিয়াম রাখো আর (কোনো দিন) রেখো না, (রাতে কিছু অংশ) সালাত আদায় করো আবার (কিছু অংশ) ঘুমাও।"[৮]

'আইশাহ (রদ্বিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত অন্য একটি বর্ণনায় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

---

[৮] আহ্মাদ এবং আবূ দাঊদ হাদীসটি সংকলন করেছেন। শায়েখ আল-আলবানি ইরওয়াহ্ আল গালীল, হাদীস নং ২০১৫-এ হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন।

> "হে 'উসমান, সন্ন্যাসব্রত তো আমাদের ওপর ফরজ করা হয়নি। আমার মধ্যে কি তোমার জন্য উত্তম আদর্শ নেই? আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভয় করি, এবং আল্লাহর দেখিয়ে দেওয়া গণ্ডিসমূহের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমিই বেশি সতর্ক।"[৯]

ব্যক্তিজীবনে বিয়ের সুফল

যেহেতু সর্বজ্ঞ এবং সর্বজ্ঞানী আল্লাহ বিয়ে করাকে আমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন, তাই এটা নিশ্চিত, বিয়ের মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে অনেক সুফল আর উপকারিতা। নিম্নে এসব উপকারিতারই একটা তালিকা দেয়া হলো—

দীন এবং ঈমানের সুরক্ষা

সৎকর্মপরায়ণ স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে সাহায্য, সহায়তা এবং উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর আনুগত্য করতে এবং পাপাচার থেকে নিজেরা বেঁচে থাকতে পরস্পরকে সহযোগিতা করে। আনাস ﷛ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আল্লাহ যখন কাউকে একজন সৎকর্মশীল স্ত্রী দান করেন, তিনি তাকে তার দীনের অর্ধেক সুরক্ষায় সাহায্য করেন। সে যেন বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে চলে।"[১০]

সতীত্বের সুরক্ষা

প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষ যেমন নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, নারীও ঠিক তেমনিভাবেই পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। আর শয়তান নারী-পুরুষের এই পারস্পরিক আকর্ষণবোধের সুযোগ নিয়ে থাকে। নারী পুরুষের নিকটবর্তী হলে কিংবা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে শয়তান পুরুষের কামোচ্ছ্বাসকে তাড়িত করে; নারীর প্রতি তাকে প্রলুব্ধ করে; নারীকে পুরুষের সামনে এক আকর্ষণীয় এবং মহনীয় অবয়বে মেলে ধরে। ফলে তারা যৌনাচার ঘটিত বিভিন্ন রকম পাপকার্যের দিকে ধাবিত হয়। উসামাহ্ ইবনু যায়েদ ﷛ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আমি আমার পরে পুরুষের জন্য নারীর চাইতে বড় কোনো পরীক্ষা ছেড়ে যাচ্ছি না।"[১১]

---

[৯] হাদীসটি ইবনু হিব্বান, আহ্‌মাদ, এবং আত-তাবারানী তাদের গ্রন্থে সংকলন করেছেন। শায়েখ আল-আলবানি ইরওয়াহ্ আল-গালীল, হাদীস নং ২০১৫-এ হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন।

[১০] আত-তাবারানী এবং আল-হাকিম হাদীসটি সংকলন করেছেন। শায়েখ আল-আলবানি আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৬২৫-এ হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন।

[১১] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

নিরাপত্তাবোধ থেকে আনন্দ লাভ

'ভালোবাসা' এবং 'দয়া' এমন দুটি তাৎপর্যময় হৃদয়ানুভূতির নাম যেগুলো জীবনকে আলোক-সুষমায় ভরিয়ে তোলে এবং জীবনে বয়ে আনে আত্মপ্রত্যয়, নিরাপত্তাবোধ ও সুখের বারতা। আল্লাহ তা'আলার অবারিত অনুগ্রহসমূহের একটি হলো এই, বিবাহিত যুগলদের হৃদয়ে তিনি পারস্পরিক সম্প্রীতি ও মমত্ববোধের সঞ্চার করেন। ফলে সুরক্ষা ও নিরাপত্তাবেষ্টিত কোনো গৃহে ভাবনাহীন জীবনযাপনের মতোই তারা একে অন্যকে হৃদয়ে সযত্নে আগলে রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

« এবং তাঁর নির্দেশনাবলির মধ্যে রয়েছে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।[১২] »

অধিকন্তু, দেহের সাথে পোশাকের সম্পর্ক যতটা নিবিড়, বিয়েও নারী-পুরুষের মাঝে তেমনি এক নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অনুপম সুখানুভূতি দিয়ে তাদেরকে জড়িয়ে রাখে। একজন আরেক জনের জন্য হয়ে ওঠে সুরক্ষা আর প্রশান্তির সুশোভিত প্রচ্ছদ। সুমহান আল্লাহ বলেন:

﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾

« তারা তোমাদের জন্য আবরণ এবং তোমরা তাদের জন্য আবরণ।[১৩] »

বৈধ পন্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণ

খাদ্যের মতো জৈবিক চাহিদাও মানুষের একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার। একজন মানুষ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন থেকেই সে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। নারী-পুরুষ পরস্পরের সাথে মিলিত হলে শারীরিক সুখ অনুভবের সাথে সাথে হৃদয়ে এক অপার্থিব আনন্দ অনুভব করে। মানুষের জীবনের দুঃখ-বেদনা, ক্লান্তি-শ্রান্তি ভুলিয়ে তাকে পুনরায় উদ্যম ফিরিয়ে দিতেও এর বিকল্প নেই। কিন্তু নারী-পুরুষের এই মিলন

[১২] সূরা আর-রুম, ৩০:২১।

[১৩] সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৮৭।

যদি হয় অন্যায় পথে অবৈধভাবে তা হলে এই নির্মল আনন্দ লাভ সম্ভব নয়; বরং এতে ক্ষণিকের শারীরিক সুখ লাভ হলেও মনের গভীরে এক অপরাধবোধ তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। অবসাদ ও বিষণ্নতা তাকে আরও ক্লান্ত করে তোলে। আমাদের প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহসমূহের অন্যতম একটি হলো এই, তিনি বিয়েকে আমাদের জৈবিক বাসনা পূরণ করার এক বৈধ পন্থা হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

« তোমরা নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ তাদের থেকে দুই দুই, তিন তিন কিংবা চার চার জনকে বিয়ে করে নাও। আর যদি সমতা রক্ষার ব্যাপারে আশঙ্কা করো তা হলে এক জনকে করো। (সূরা আন নিসা, আয়াত ৩) »

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করতে তাঁর উম্মাহকে উৎসাহ দিয়ে বলেন:

> "বিয়ে আমার সুন্নাহ্। যে আমার সুন্নাহ মোতাবেক কাজ করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা বিয়ে করো। কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করব। অতএব যার সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে। আর যার নাই সে যেন সিয়াম পালন করে। কেননা, সিয়াম একে (জৈবিক চাহিদাকে) প্রশমিত করে।"[১৪]

ইবনে 'উমার এবং ইবনে 'আমর ؓ বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

> "দুনিয়ার সবকিছুই আসলে ক্ষণকালীন সম্পদ। তবে দুনিয়ার এসব ক্ষণকালীন সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে ভালোটি হলো পুণ্যবতী স্ত্রী।"[১৫]

সৎকর্ম বৃদ্ধির সুখময় পন্থা

বিয়ে কেবল বৈধ পন্থায় জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমই নয় বরং বিয়ে হলো নিজের 'আমলনামায় সৎকর্ম সঞ্চয়ের এক মাধ্যম। আবূ যর ؓ বর্ণনা করেন,

> "আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কিছু সাহাবী তাঁর নিকট অভিযোগ করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, সম্পদশালী ব্যক্তিরা তো সব সওয়াব নিয়ে গেছে। আমরা যেমন সালাত আদায় করি, তারাও করে। আমরা যেমন সিয়াম পালন করি, তারাও করে। কিন্তু তারা তাদের

[১৪] সুনান ইবনু মাজাহ্, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৯, হাদীস নং ১৮৪৬, পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯। শায়েখ আল-আলবানি আস-সহীহাহ, হাদীস ২৩৮৩-এ হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন।

[১৫] মুসলিম, খণ্ড ৪, অধ্যায় ১৭, হাদীস নং ৩৬৪৯, পৃষ্ঠা ১২৭; সুনান আন-নাসা'ঈ, খণ্ড ৪, অধ্যায় ২৬, হাদীস নং ৩২৩৪, পৃষ্ঠা ১০৩ এবং আহ্মাদ।

উদ্বৃত্ত সম্পদ দান করে সওয়াব লাভ করছে অথচ আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না'।"
তিনি ﷺ উত্তরে বললেন:

"কিন্তু আল্লাহ কি তোমাদেরকে তা দান করেননি যা তোমরা সাদাকাহ্ করতে পারো?

প্রতিটি তাসবীহ ('সুবহানাল্লাহ্'—'আল্লাহ পবিত্র' পাঠ করা) হলো সাদাকাহ্;

প্রতিটি তাকবীর ('আল্লাহু আকবার'—'আল্লাহ মহান' পাঠ করা) হলো সাদাকাহ্;

প্রতিটি তাহলীল ('লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'—'আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ্ নেই' পাঠ করা) হলো সাদাকাহ্;

প্রতিটি তাহ্মীদ ('আলহামদুলিল্লাহ্'—'প্রশংসা আল্লাহর জন্য' পাঠ করা) হলো সাদাকাহ্;

সৎকাজের আদেশ করা হলো সাদাকাহ্;

মন্দকে প্রতিহত কিংবা নিষেধ করা হলো সাদাকাহ্;

এবং তোমার (স্ত্রীর সাথে) সহবাস করাও হলো সাদাকাহ্।"

সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কেউ জৈবিক চাহিদা পূরণ করলে তাতেও তার সওয়াব হবে?"

তিনি ﷺ উত্তরে বললেন: "তোমরা বলো দেখি, যদি তোমাদের কেউ তা হারাম কাজে (যিনা) ব্যবহার করত তা হলে কি তার পাপ হতো না?"

তারা উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

অতঃপর তিনি ﷺ বললেন: "অনুরূপভাবে যখন সে তা হালাল উপায়ে ব্যবহার করবে তাতে তার সওয়াব হবে।"

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ আরও বেশ কিছু বিষয়ের উল্লেখ করলেন যেগুলো করলে সাদাকাহ্ বলে গণ্য হয় এবং এই বলে শেষ করলেন যে:

"আর এ সবকিছুরই পরিপূরক হচ্ছে দুহার দুই রাক'আত সালাত।" [১৬]

সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"তোমরা যা কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খরচ করবে তার জন্য তোমাদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। এমনকি তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের মুখে যে খাবার তুলে দাও তার জন্যও।" [১৭]

ইব্‌ন মাসঊদ رضي الله عنه বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

---

[১৬] মুসলিম এবং আহ্মাদসহ অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন।

[১৭] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৯৫, মুসলিম হাদীস নং ১৬২৮

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার ইচ্ছায় তার পরিবারের জন্য খরচ করে, তা হলে তা তার জন্য সাদাকা বলে গণ্য হবে।"[১৮]

সুশৃঙ্খল জীবনযাপন

অনেক সমাজে দেখা যায়, ছেলেরা লেখাপড়া শেষ করার পর একটা লম্বা সময় বেকার জীবন যাপন করে। তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়, রকে বসে আড্ডা মারে। কাজকর্ম করে না এবং নানরকম অপরাধমূলক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডেও নিজেরা জড়িয়ে পড়ে। এমন ছেলেদের নিয়ে পিতা-মাতাদের দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। মুরব্বীরা বলে থাকেন তাদেরকে বিয়ে করিয়ে দিতে। পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেও অনেক ছেলে কাজকর্ম করে; তবে পিতামাতাসুলভ স্নেহবাৎসল্যের কারণে কিছু পিতা-মাতা সন্তানের অকর্মণ্যতা ও অলসতাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। তাই সেসব সন্তান তেমন দায়িত্ববোধ অনুভব করে না। এ কারণে তাদের মধ্যে একটা গা-ছাড়া ভাব চলে আসে। কিন্তু বিবাহিত হলে পরে দাম্পত্যজীবনে স্ত্রীর কাছ থেকে এতটা ছাড় আশা করা যায় না। তার অধিকার তাকে বুঝিয়ে দিতে হয়। বাবা-মা'র কাছে সে সন্তান হওয়ায় সেখানে তার অক্ষমতার কারণে নিজেকে অপমানিত বোধ করে না। কিন্তু বিয়ে করে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দিতে না পারাটা তার পৌরুষে এসে আঘাত করে। স্ত্রীর কাছে তখন নিজের ভাব-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়। একইভাবে সন্তানের ভরণ-পোষণের জন্য সে আরও গভীর দায়বোধ অনুভব করে।[১৯]

তাই এসব কারণে বিয়েকে মানবজীবনকে সুশৃঙ্খল করার একটি চমৎকার উপায় বলা যেতে পারে। বিয়ে মানবজীবনকে সুশৃঙ্খল, সুসমন্বিত করে তোলে। এতে জীবন-ঘনিষ্ঠ নানান সমস্যার সমাধান হয়। বাউন্ডুলে জীবনধারার অবসান ঘটে। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর বিষণ্ণতার নিরসন ঘটে।

---

[১৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫, মুসলিম হাদীস নং ১০০২

[১৯] (আমাদের গ্রামাঞ্চলে ছেলেরা বখে গেলে মুরব্বীরা তাদের পিতা-মাতাকে বলে থাকেন, 'কাঁধে জোয়াল দাও।' এটি একটি প্রবাদের মতো। গরু দিয়ে হাল-চাষ করার সময় দুটো গরু পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তাদের কাঁধে যে কাঠের খণ্ডটি দেওয়া হয় একে বলে জোয়াল। এটা কাঁধে না দেওয়া পর্যন্ত গরু হাঁটে না। পুরুষের কাঁধের জোয়াল বলা হয়েছে স্ত্রীকে। স্ত্রীর দায়িত্ব কাঁধে পড়লে ঠিকই সে আড্ডাবাজি ছেড়ে আয়-রোজগারের পথে নেমে পড়ে—সম্পাদক)।

বিয়ের সামাজিক সুফল

উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজ বিয়ের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করে থাকে। নিম্নে বিয়ের সামাজিক সুফলগুলোর একটি তালিকা দেয়া হলো:

মানবজাতির ধারাকে অব্যাহত রাখা

পশ্চিমা অনেক দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মাইনাসের দিকে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বহির্মুখী কর্মজীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় তাদের মধ্যে বিয়ের প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে। ফলে তাদের মধ্যে যিনা-ব্যভিচারের হার বেড়ে গেছে এবং সন্তান গ্রহণের প্রবণতা অনেকাংশে কমে গেছে। এ কারণে তারা নানা প্রোগ্রামের নামে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে লোকদেরকে নিয়ে নাগরিকত্ব প্রদান করে জনসংখ্যার হার ধরে রাখার চেষ্টা করছে। এই প্রক্রিয়া কোনো কারণে ব্যাহত হলে তাদের অবস্থা হবে করুণ। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সেসব জাতিগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে পৃথিবীর বুক থেকে।

বিয়ের মাধ্যমে আল্লাহ পৃথিবীতে মনুষ্য ক্রমধারাকে জারি রাখার জন্য তাঁর সৃষ্ট বিধানকে পূর্ণ করে থাকেন। আর এভাবেই বিয়ে মানবজাতির ক্রমধারা অব্যাহত রাখার একমাত্র সঠিক পন্থা হিসেবে ভূমিকা পালন করে যাবে যতদিন না আল্লাহ পৃথিবী এবং এতে যা কিছু রয়েছে তার পরিসমাপ্তি ঘটাবেন।

আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি

বিয়ের মাধ্যমে মানুষে-মানুষে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি হয়। একটি মানবজুটির মিলনের মধ্য দিয়ে একাধিক পরিবার, গোত্র ও সমাজের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। বিয়ের মাধ্যমেই মানুষ সন্তান লাভ করে, পিতা-মাতা এবং সন্তান-সন্ততিদের মাঝে এক পবিত্র বন্ধন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই বন্ধন তাদেরকে পরস্পরের প্রতি দায়িত্বশীল করে তোলে। এতে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মানুষগুলোর মাঝে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

নৈতিক অবক্ষয় থেকে সুরক্ষা

নারী ও পুরুষের মাঝে বৈধ এবং রুচিসম্মত সম্পর্ক স্থাপনের সর্বোত্তম পন্থা হলো বিয়ে। বিয়ে সতীত্বের রক্ষাকবচ যা মুসলিম নারী-পুরুষকে অশ্লীলতা এবং এ ধরনের

সকল প্রকার পাপাচারে নিপতিত হওয়া থেকে বাঁচায়। ফলে বিয়ে নৈতিক অবক্ষয় এবং অধঃপতনের জন্য দায়ী ওই সকল নোংরামি আর কুকর্মের দুয়ারকে বন্ধ করে দেয়, যা বহু সমাজকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ রাখা

ব্যভিচার ও অশ্লীলতার পরিণতি হলো বেশ কিছু প্রাণঘাতী রোগব্যাধি। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— গনোরিয়া, সিফিলিস ও বিভিন্ন প্রকার যৌনঘটিত আলসার। আর এগুলোর সাথে সাম্প্রতিক সময়ে যোগ হয়েছে মরণব্যাধি 'এইডস'। এগুলো ছাড়াও রয়েছে আরও অনেক রোগ, যার দ্বারা মানুষ সহজেই সংক্রমিত হয়ে থাকে। এমনকি শিশুরাও এসব রোগ থেকে রেহাই পায় না। সমাজকে এ সকল রোগব্যাধি থেকে রক্ষা করার সর্বোত্তম উপায় হলো বিয়ে।

পারিবারিক পরিবেশ গড়ে তোলা

পারিবারিক প্রশান্তি ও নিরাপত্তাবোধ মহান আল্লাহর এক মহান নিয়ামত। এখানে যে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ মানুষ লাভ করে তা পরিবারের বাইরে কোথাও লাভ করা সম্ভব নয়; সে পরিবারের নীড়টুকু যতই জীর্ণশীর্ণ হোক না কেন। ঘর থেকে বাইরে থাকার মধ্যে একধরনের ক্লান্তিবোধ কাজ করে; তাতে বাইরে যতই আনন্দ ও আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা থাকুক না কেন। আর ঘরে মানুষ প্রশান্তি বোধ করে; তাতে সেখানে সে যতই ব্যস্ত থাকুক না কেন। এই পরিবার গড়ে তোলার মৌলিক একক হলো স্বামী ও স্ত্রী। আর বিয়ের মধ্য দিয়েই গঠিত হয় এই পরিবার।

এরপর আসে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুচারুরূপে গড়ে তোলার দায়িত্ব। একজন মানুষের সন্তান-সন্ততি লালন-পালনের জন্য একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিয়ে হলো একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ। আমাদের সন্তান-সন্ততিরা হলো আমাদের দাম্পত্যের ফসল; এবং এরাই হবে ভবিষ্যৎ মুসলিম উম্মাহর আদর্শ নারী-পুরুষ। সার্থক বিয়ের পরিণতি হিসেবে ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা, দয়া এবং সত্যের সুশিক্ষা দিয়ে আমরা সন্তানদেরকে গড়ে তুলি যা তাদের সুষ্ঠুভাবে বেড়ে ওঠার জন্য এবং তাদের মানবিক বিকাশের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

মুসলিম জাতিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করা

ইসলাম শুধু সংখ্যা বা পরিমাণের ভিত্তিতে বিচার করে না; বরং গুণ ও মানের ভিত্তিতে সংখ্যা বা পরিমাণকে হিসেব করে থাকে। সে কারণেই আমাদেরকে মানসম্পন্ন মুসলিমের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কেবল নাম ও লেবাসধারী মুসলিমের সংখ্যা নয়। মানসম্পন্ন মুসলিম হলো তারাই যারা সুমহান আল্লাহর হুকুম ও তাঁর প্রেরিত রাসূল ﷺ-এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলে। এ ধরনের মানুষের সংখ্যাই বৃদ্ধি করতে হবে; এবং বহুগুণে বৃদ্ধি করতে হবে যারা পৃথিবীতে আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করবে এবং পরকালে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ন্যায়পরায়ণ এবং সৎকর্মশীল মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য নিয়েই একজন মুসলিম বিয়ে করবে। ফলে নিজের পরিবারকে একমাত্র সত্য দীন ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। শুধু তখনই এই পরিবার ঐসকল মুসলিমদের সংখ্যাভুক্ত হবে যারা বিচারের দিনে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এতোটাই সন্তুষ্ট এবং আনন্দিত করবে, তিনি তাঁর উম্মাহর ব্যাপারে পূর্ববর্তী অসংখ্য জাতির সামনে গর্ববোধ করবেন। আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "বিয়ে করো! কেননা, আমি তোমাদের মাধ্যমে সংখ্যা নিয়ে গর্ব করতে চাই।"[২০]

আবু উমামাহ্ رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "বিয়ে করো! কেননা আমি তোমাদের মাধ্যমে অন্য জাতিসমূহের চেয়ে সংখ্যায় অধিক হতে চাই। খ্রিষ্টানদের মতো সন্ন্যাসব্রত ধোরো না।"[২১]

---

[২০] সুনান ইবনু মাজাহ্, খণ্ড ৩, অধ্যায় ৯, হাদীস নং ১৮৬৩, পৃষ্ঠা ৬৯, আল-হাকিম, ২/১৬০; শায়েখ আল-আলবানি সহীহুল জামে', হাদীস নং ১৫১৪-এ হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন।

[২১] আল-বায়হাকি সহ অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন; শায়েখ আল-আলবানি সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৯৪১ এবং আস-সহীহাহ হাদীস নং ১৭৮২-এ হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন।

স্বামী-স্ত্রী নির্বাচন পর্ব

পূর্বের অধ্যায়ে আমরা বিয়ের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কী তা দেখিয়েছি। উল্লিখিত গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে সামনে রেখেই একজন মুসলিম নারী এবং পুরুষকে তাদের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী নির্বাচনের জন্য তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যাতে তারা সর্বোচ্চ সন্তোষজনক পন্থায় বিয়ের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করতে পারে। আর এই বিষয়টিই স্বামী-স্ত্রী নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে অনেক বেশি গুরুত্ব ও তাৎপর্যবহ করে তোলে। একজন স্ত্রী হতে পারে সুখের কেন্দ্রবিন্দুকিংবা দুঃখ-দুর্দশা ও অশান্তির উৎস। একজন সৎকর্মশীলা, পুণ্যবতী স্ত্রী যেমন এই জীবনে সুখ লাভের একটি প্রধান উৎস, ঠিক তেমনি একজন মন্দ স্ত্রী জীবনে দুঃখ-দুর্দশা ও অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ,। তাই বিয়ের জন্য পাত্র-পাত্রী বাছাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা বলেন:

> « যদি তোমরা ইয়াতিম মেয়েদের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করতে না পারার ভয় করো তবে নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমাদের ভালো লাগে তাদের মধ্য থেকে দুই জন, তিন জন কিংবা চার জনকে বিয়ে করে নাও; তবে যদি তোমরা সমতা রক্ষা করতে না পারার আশঙ্কা করো তা হলে একজনকে... »[২২]

আলোচ্য আয়াতে যদিও নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে ভালো লাগে তাদেরকে বিয়ে করতে বলা হয়েছে, তবে একইসাথে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র বিভিন্ন বর্ণনায় সেই ভালো লাগার কারণগুলোকেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষ স্বভাবজাতভাবে ত্বরাপ্রবণ, আবেগী ও অদূরদর্শী। তাই ক্ষণিকের কোনো ভালো লাগার আগুনে যেন তাকে সারা জীবন জ্বলতে না হয় সেজন্য ইসলাম সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। কোন কোন গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো সত্যিকার ও দীর্ঘস্থায়ী ভালো লাগা হিসেবে বহাল থাকবে,

---

[২২] সূরা আন নিসা, ৪:৩

কোন ভালো লাগার মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে, আর কোন ভালো লাগায় অকল্যাণ রয়েছে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো কোনো ব্যক্তিকে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করতে হয়, তার এমন কিছু বিষয় পাঠকদের জন্য নিচে তুলে ধরা হলো—

আদর্শ পাত্রীর বৈশিষ্ট্য

সৎকর্মশীলতা

একজন স্ত্রীর প্রথম এবং সর্বপ্রধান গুণ হলো তার সৎকর্মশীলতা। নবিজি ﷺ পুরুষদেরকে বিয়ের জন্য সৎকর্মশীল, পুণ্যবতী নারী অন্বেষণ করার তাগিদ দিয়েছেন এবং এই ধরনের নারীকে বিয়ে করলে পুরুষ সুখী হবে বলে ইঙ্গিত করেছেন। আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "কোনো নারীকে চারটি কারণে বিয়ে করা হয়ে থাকে—ধনসম্পদ, সামাজিক অবস্থান, সৌন্দর্য এবং দীন (ধার্মিকতা); কাজেই যে দীনসম্পন্ন তাকেই খুঁজো যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"[২৩]

সাওবান رضي الله عنه বর্ণনা করেন,

> সোনা-রূপা[২৪] সঞ্চয়কারী লোকদের সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তা'আলা যখন আয়াত অবতীর্ণ করলেন, তখন সাহাবারা ভাবলেন, 'আমরা তা হলে কোন ধরনের সম্পদ জমা করে রাখবো'? 'উমার رضي الله عنه বললেন, 'আমি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজবো।' রাসূল ﷺ-এর নাগাল না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তার উট নিয়ে দ্রুত সামনে এগোতে থাকলেন। তখন তিনি (সাওবান) তার ঠিক পেছনেই ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, কোন ধরনের সম্পদ আমাদের সঞ্চয় করা উচিত?' তিনি উত্তরে বললেন:
>
> "তোমাদের প্রত্যেকের যেন (আল্লাহর প্রতি) কৃতজ্ঞ হৃদয়, সর্বদা (আল্লাহর) প্রশংসাকারী জিহ্বা এবং এমন একজন স্ত্রী থাকে যে তাকে পরকালের ব্যাপারে সহায়তা করে।"[২৫]

---

[২৩] আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন।

[২৪] আত-তাওবাহ; ৯:৩৪-৩৫

[২৫] আহমাদ এবং আত-তিরমিযিসহ অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন। শায়েখ আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস সহীহাহ, হাদীস নং ২১৭৬)।

উত্তম চরিত্র

স্ত্রী হিসেবে এমন কাউকে খুঁজতে হবে যে উত্তম চরিত্রের অধিকারিণী কিংবা যে উন্নত নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন পরিবেশে লালিত-পালিত এবং বড় হয়েছে। এমনকি শারীরিক সৌন্দর্য কিংবা ধনসম্পদের মতো লোভনীয় বৈশিষ্ট্য থাকলেও স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুর্বল নৈতিক চরিত্রের নারীকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। আবু সা'ঈদ আল খুদরী ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> "(সাধারণত) তিনটি বৈশিষ্ট্যের কোনো একটির কারণে নারীদেরকে বিয়ে করা হয়—সম্পদের জন্য, সৌন্দর্যের জন্য এবং দীনদারিতার জন্য। তবে তুমি শুধু দীনদার ও উত্তম চরিত্রবান নারীকে গ্রহণ করো; তুমি সফলকাম হতে পারবে।"[২৬]

আবু মূসা আল–আশ'আরি ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "তিনজন ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহর কাছে দু'আ করলে তাদের দু'আ কবুল হয় না—এমন ব্যক্তি যার দুশ্চরিত্রবান স্ত্রী আছে অথচ সে তাকে তালাক দেয় না, এমন ব্যক্তি যে কারও কাছে কোনো সম্পদ গচ্ছিত রাখলো কিন্তু সাক্ষী রাখলো না, এবং সেই ব্যক্তি যে নির্বোধ মানুষকে তার সম্পদ দিয়ে দেয়।"[২৭]

এই হাদীসে 'দুশ্চরিত্র' বলতে মূলত চারিত্রিক দুর্বলতা এবং অশ্লীলতাকে বোঝানো হয়েছে যা নারীর আচার-আচরণকে সন্দেহজনক এবং তার সতীত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই ধরনের স্ত্রী যে পুরুষের অধীনে থাকে তাকে বলে 'দাইয়্যুস'।

কুমারীত্ব

কুমারীত্ব বিয়ের জন্য কোনো শর্ত নয়। তবে যদি একাধিক নারীর মধ্য থেকে যেকোনো একজনকে পছন্দ করার সুযোগ থাকে এবং অন্যান্য সবদিক থেকে তাদের সকলেই সমপর্যায়ের হয়, তা হলে যে কুমারী তাকেই স্ত্রী হিসেবে বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই কুমারীত্ব এমন একটি বিষয় যা স্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেবল একটি বাড়তি বৈশিষ্ট্য হিসেবে পছন্দের পাল্লাকে ভারী করে।

জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ ﷺ বর্ণনা করেন,

---

[২৬] সহীহ ইবন হিব্বান, মুসনাদ আহমাদ ও আল হাকিম। আলবানি সহীহ সাব্যস্ত করেছেন: আস সহীহাহ, ৩০৭

[২৭] আল-হাকিম, আবু নুয়াইম এবং অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৩০৭৫ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৮০৫)।

> "মৃত্যুকালে তার পিতা নয়জন মেয়ে রেখে মারা যান[২৮] যাদেরকে দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল জাবিরের ওপর। অল্প কিছুদিন পরেই জাবির একজন অকুমারীকে বিয়ে করেন। নবিজি ﷺ-এর সাথে তার দেখা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, "হে জাবির, তুমি কি বিয়ে করেছ?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।" তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কি কুমারী, না অকুমারী?" তিনি উত্তর দিলেন, "অকুমারী।" তিনি বললেন, "কেন কুমারী বিয়ে করলে না! তা হলে পরস্পর (অধিক) আনন্দ-ফুর্তি ও এক সাথে হাসি-তামাশা করতে পারতে।" জাবির উত্তর দিলেন, "আসলে আমার পিতা 'আবদুল্লাহ্ অনেকগুলো মেয়ে রেখে মারা গেছেন। আমি চাইনি, তাদের মতোই কমবয়সী আরও একজন তাদের সাথে যোগ হোক; তাই আমি একজন পূর্ণবয়স্কা মহিলাকে বিয়ে করেছি যাতে সে তাদের যত্ন নিতে পারে এবং তাদের দেখাশোনা করতে পারে।"

অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন:

> "নিশ্চয়ই তুমি উত্তম সিদ্ধান্ত নিয়েছ। তোমার জন্য আল্লাহ্ অফুরন্ত কল্যাণ দান করুন।"[২৯]

আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস 'উদ ﷺ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন:

> "কুমারী নারীদেরকে বিয়ে করো, তাদের কথা মধুরতর, গর্ভ উর্বর এবং অল্পতে সন্তুষ্ট হয়।"[৩০]

তবে মনে রাখতে হবে, স্বয়ং আমাদের প্রিয় নবিজি ﷺ প্রথম যাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি ছিলেন অকুমারী, পূর্বে বিবাহিতা এবং তাঁর চেয়ে প্রায় পনেরো বছরের বড়। শুধু তাই নয়, তাঁর স্ত্রীদের মধ্য থেকে শুধু এক জন ব্যতীত বাকি সকলেই ছিলেন অকুমারী। তাই কুমারী হওয়াটা বিয়ের জন্য কোনো অপরিহার্য শর্ত নয়; বরং অন্যান্য দিক থেকে যদি সকলেই একই মানের পাত্রী হয় তবে কেউ কুমারী হলে সেটা হবে তার একটি বাড়তি বৈশিষ্ট্য। অনেক ক্ষেত্রে বিধবা, কিংবা তালাকপ্রাপ্ত নারীদেরকে বিয়ে করা উত্তম বলেও বিবেচিত হতে পারে—বিশেষত যে সমাজে তাদের জন্য বিয়ে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সন্তানধারণে সক্ষমতা

যেহেতু বিয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো সন্তান জন্মদান, তাই এমন ধরনের কমবয়সী যুবতী নারীকে বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে স্বাভাবিকভাবেই অধিক

[২৮] জাবিরের পিতা, আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমর ইবনু হারাম, উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন। ওই সময় বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর।

[২৯] আল-বুখারি, মুসলিম এবং অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন।

[৩০] মু'জামুল কাবীর, আলবানি হাসান সাব্যস্ত করেছেন।

সন্তান জন্মদানে সক্ষম। মা'কিল ইবনু ইয়াসার ﷺ বর্ণনা করেন,

> এক লোক আল্লাহর রাসূলের ﷺ কাছে এসে বলল, "আমি এক সম্ভ্রান্ত এবং সুন্দরী মহিলার দেখা পেয়েছি, কিন্তু সে বন্ধ্যা। আমার কি তাকে বিয়ে করা উচিত?" তিনি বললেন, "না।" তাঁকে আরও দুই বার জিজ্ঞেস করলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন: "এমন নারীকে বিয়ে করো যে প্রেমময়ী এবং অনেক সন্তান-ধারণের ক্ষমতা রাখে, কারণ, (কিয়ামতের দিন) আমি তোমাদের সংখ্যা নিয়ে গর্ব করব।"[৩১]

মনে রাখতে হবে এই নিরুৎসাহিতকরণের অর্থ এই নয়, সন্তানধারণে অক্ষম নারীকে একেবারেই বিয়ে করা যাবে না। এখানে অধিক সন্তানধারণে সক্ষম নারীকে বিয়ে করতে উৎসাহিত করা হয়েছে মাত্র। এর অর্থ হলো এটা মুস্তাহাব, আর সন্তান-ধারণে অক্ষম নারীকে বিয়ে করা মাকরুহ। প্রশ্ন হতে হতে পারে, সন্তান ধারণে অক্ষম নারীকে কেউ যদি বিয়ে না করে তা হলে তার জীবন কীভাবে চলবে। সেক্ষেত্রে তিনি এমন কোনো পুরুষের স্ত্রী হতে পারেন যিনি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এবং অন্য স্ত্রী থেকে তার সন্তান রয়েছে বা সন্তান লাভের আশা করা যায়।

একই সাথে মনে রাখতে হবে, সন্তানধারণে অক্ষম কিংবা সক্ষম হওয়া কোনোটাই মানুষের নিজস্ব যোগ্যতা কিংবা অযোগ্যতা নয়। এটা একমাত্র আল্লাহরই এখতিয়ার এবং তাঁরই ইচ্ছাধীন। তিনি বলেন:

> « আসমান ও জমিনের যাবতীয় ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর জন্য; তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। কাউকে কন্যাসন্তান দেন, আবার কাউকে পুত্রসন্তান দেন; কাউকে চাইলে পুত্র-কন্যা দুটোই দান করেন। আবার যাকে ইচ্ছা তিনি বন্ধ্যা করে রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি সুউচ্চ ও প্রজ্ঞাময়।[৩২] »

অনেক পরিবারে দেখা যায়, বন্ধ্যা নারীদেরকে অপয়া-অলক্ষুণে মনে করা হয়। অনেক কাজে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেওয়া হয়। এটা সম্পূর্ণ জাহিলি যুগের পৌত্তলিকদের আচরণ। কোনো মুসলিম যদি এ ধরনের আচরণ করেন তা হলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, তিনি মুশরিকদের দ্বারা প্রভাবিত এবং তার মধ্যে সুস্পষ্ট জাহিলিয়াত বিদ্যমান। মুসলিম জাতি একটি জ্ঞানসমৃদ্ধ আলোকিত জাতি। এ ধরনের কুসংস্কারে বিশ্বাস তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে মোটেই মানানসই নয়।

---

[৩১] হাদীসটি আবূ দাউদ এবং আন- নাসা'ঈ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৯৪০ এবং ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৭৮৪)।

[৩২] সূরা শূরা, ৪২:৪৯-৫০

মমতাময়ী আচরণ

জীবনের দুটো দিক রয়েছে—ঘর এবং বাহির। বাইরের পৃথিবী স্বভাবতই বাস্তবতা, কঠোরতা ও রুক্ষতায় ভরা থাকে। মানুষ যদি শুধু বাইরের এই রুক্ষ জীবন যাপন করত তা হলে তার মধ্য থেকে আদর-মায়া, স্নেহ-মমতা বিদায় নিত। এটা হতো এক মহা বিপর্যয়। মানুষ বাইরের জগৎ থেকে কাজকর্ম সেরে যখন ঘরে ফেরে, তখন তার প্রশান্তির জন্য প্রয়োজন হয় একটু আদর-মমতার ছোঁয়া, যা তার সারা দিনের ক্লান্তি মুছে দিয়ে তাকে আবার সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তুলবে। একইভাবে সন্তান প্রতিপালন এমনই একটি দায়িত্ব, যা মমতাময়ী বৈশিষ্ট্য ছাড়া পালন করা সম্ভব নয়। শিশুরা যেহেতু কোমল ও নাজুক প্রকৃতির হয়ে থাকে, তাই তাদের প্রতিপালনের জন্য আদর-স্নেহ মায়া-মমতার বিকল্প নেই।

তাই স্বামী-সন্তানের প্রতি মমতাময়ী এবং যত্নশীল আচরণের আশা করা যায় এমন নারীকে বিয়ে করার চেষ্টা করতে হবে। নারীর এই বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত তার বেড়ে ওঠার পরিবেশ এবং বংশমর্যাদা থেকে আঁচ করা সম্ভব। মা'কিল ইবনু ইয়াসার ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে পরোক্ষভাবে এই বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। একই মর্মে আবু উসাইনাহ্ আস-সাদাফি ﷺ থেকে বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "তোমাদের নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তারাই যারা অনেক সন্তান জন্মদানে সক্ষম, যারা (তাদের স্বামীদের প্রতি) প্রেমময়ী, প্রশান্তিদায়ী এবং সহিষ্ণু—যখন তারা আল্লাহকে ভয় করবে। আর তোমাদের নারীদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হলো তারা, যারা (পরপুরুষকে) তাদের সৌন্দর্য দেখায় এবং যারা দর্পভরে চলাচল করে। এরাই হলো কপট এবং এদের যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা হবে লাল ঠোঁট এবং লাল পা-ওয়ালা কাকের মতোই বিরল।"[৩৩]

অল্পে তুষ্টি

বস্তুর পরিমাণের মধ্যে নয় বরং শান্তি নির্ভর করে মানুষের মনের তৃপ্তির ওপর। বিশেষত ঘরের স্ত্রী যদি অল্পে তুষ্ট না হয় তবে তার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে স্বামীকে অনেক সময় সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে চেষ্টা করতে হয়; আর তখনই স্বামীর দ্বারা শুরু

---

[৩৩] হাদীসটি আল-বায়হাকি (তার সুনান গ্রন্থে) এবং অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৩৩৩০ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৮৪৯)। এ ছাড়াও হাদীসের (কাক-বিষয়ক) শেষাংশটুকু আহমাদসহ অন্যান্যরা 'আমর ইবনুল 'আস ﷺ থেকে সংকলন করেছেন এবং আল-আলবানি এটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৮৫০)।

হয় অন্যায় ও দুর্নীতি। তাই স্ত্রীর মাঝে অল্পে তুষ্টির গুণ খুঁজতে হবে। স্ত্রী অতৃপ্তিতে ভুগলে তা স্বামীর জীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত করে ফেলবে এবং স্ত্রী নিজের ইচ্ছাপূরণের জন্য স্বামীকে যা ইচ্ছে তা-ই করাতে বাধ্য করাবে। স্বামীর আর্থিক অবস্থা এবং স্বামী যা দেয় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা একজন কুমারীর পক্ষে যতটা সম্ভব একজন অকুমারীর পক্ষে ততটা নয়। কারণ, তার পূর্বের স্বামী যদি তাকে বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তুলে থাকে এবং বর্তমান স্বামী যদি সেই মানের লাইফস্টাইল বজায় রাখতে অসমর্থ হয় তা হলে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। আর একজন কুমারী জীবনের বাস্তবতার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ নারী; তার চাহিদা পূরণের ব্যাপারে সে যেমনভাবে ভাববে, একজন অভিজ্ঞ নারী হয়তো সেভাবে চিন্তা করবে না। সে হয়তো তার চাওয়া-পাওয়া আদায় করতে স্বামীকে চাপ প্রয়োগ করবে। পক্ষান্তরে একজন কুমারী নারীকে নিয়ে তার স্বামী যেভাবে জীবনযাপন শুরু করবে, সে তার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেবে। তাই হাদীসে অল্পে তুষ্টিকে কুমারীত্বের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ্ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "(বিয়ের জন্য) কুমারীদেরকে খুঁজবে; কারণ, এদের গর্ভ অধিক উর্বর, এরা অধিক মিষ্টভাষিণী, কম শঠতাপূর্ণ, এবং এরা অল্পতে খুব সহজে সন্তুষ্ট হয়।"[৩৪]

তবে এটা কোনো একমুখী সরল অঙ্ক নয়। মূল কথা হলো অল্পে তুষ্টি। যদি তা কোনো অকুমারী নারীর মধ্যে পাওয়া যায় তা হলে তাকেও অন্য পাঁচ জনের মতো এই গুণের বিচারে প্রাধান্য দিতে হবে

সরলমতিত্ব

সরলমতিত্ব, চারিত্রিক সারল্য, মাধুর্য এবং নিষ্কলুষ হৃদয়—এগুলো হলো নারী চরিত্রের প্রশংসনীয় দিক যা একজন স্ত্রীর মাঝে খুঁজতে হবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো অকুমারীদের চাইতে কুমারীদের মধ্যেই বেশি পরিমাণে উপস্থিত। আর পারিবারিক 'পলিটিক্সে' তাদের অনভিজ্ঞতাই এর প্রধান কারণ,। জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসে এ বিষয়টিই ফুটে উঠেছে। অবশ্য বর্তমান সময়ে বিজাতীয় টিভি সিরিয়ালগুলো দেখে দেখে নারীরা বিয়ের আগেই পারিবারিক পলিটিক্সে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠছে। এই

---

[৩৪] হাদীসটি আত-তাবারানি (তার আল-আসওয়াত গ্রন্থে) এবং আদ্-দিয়্যা'উল মাক্বদিসি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৬২৪ এবং সহীহুল জামে', হাদীস নং ৪০৫৩)।

গুণবৈশিষ্ট্য আগে থেকে যাচাই করে নেওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। চেষ্টা করতে হবে তার পারিবারিক পরিবেশ ও ঐতিহ্য দেখে বুঝে নিতে। যেসব পরিবার নিজেদের ভাই-বোন, মামা-চাচা ও নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে, পরস্পরের বিরুদ্ধে কূটচালি করে না তাদের মধ্যে এই সারল্য অধিক মাত্রায় বজায় থাকার সম্ভাবনা থাকে। যে পরিবারে নিকটজন, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কুট সম্পর্ক রাখা, কিংবা সম্পর্কচ্ছেদের কালচার আছে, সেই পরিবেশে বেড়ে ওঠা ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নোংরা পারিবারিক পলিটিক্সের বীজ বপিত হয়ে যায়।

সৌন্দর্য

দুঃখজনক হলেও সত্য যে—সাধারণ সমাজ তো বটেই, আমাদের যেসব লোকেরা নিজেদেরকে ধার্মিক ভাবতে পছন্দ করেন তাদের সমাজের অবস্থাও আজকাল খুবই খারাপ। পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যগুলোকে ইসলাম তুলনামূলক গুরুত্বের দিক থেকে সবার শেষে স্থান দিয়েছে সেগুলোকেই সবার ওপরে উঠে এসেছে। রাস্তাঘাটে, বিলবোর্ডে, বিজ্ঞাপনচিত্রে, নাটক-সিনেমায় সারাক্ষণ মেকআপ-মাখা পরিপাটি সাজের আবেদনময়ী ভঙ্গিমায় সুন্দরী নায়িকা ও মডেলদেরকে দেখতে দেখতে মানুষের মন এখন নারী ভাবতে কেবল তাদের মতো নারীকেই কল্পনা করে। এটা একটা ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিতে রূপান্তরিত হয়েছে। একজন নারীকে কেবল তার চামড়ার রং আর শারীরিক কাঠামো দিয়েই মূল্যায়ন করা হচ্ছে। ত্বক ফর্সাকারী ক্রিম ও প্রসাধনী সামগ্রীর বিজ্ঞাপনগুলোতে নারীর জীবনের সফলতাকে গেঁথে দিচ্ছে কেবলই তার গায়ের রঙ আর চেহারার সৌন্দর্যের সাথে। তার মেধা, যোগ্যতা, গুণ-বৈশিষ্ট্য সবকিছু যেন গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ কারণে পাত্রী পছন্দের ক্ষেত্রে চেহারা ফিগারের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হলেই লোকেরা কেবল অন্য বিষয় বিবেচনা করে। কিন্তু ইসলামে একজন স্ত্রীর মাঝে যেসব বৈশিষ্ট্য খুঁজতে হয় তার মধ্যে সৌন্দর্য, অর্থ-সম্পদ এবং সামাজিক অবস্থানকে গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসবের বিনিময়ে স্ত্রীর সৎকর্মশীলতা, মেধা, যোগ্যতা, চরিত্র-বৈশিষ্ট্য কিছুতেই বিসর্জন দেওয়া যাবে না।

তবে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হিসেবে মনে করা হলেও সৌন্দর্যের বিষয়টিকে আমরা একেবারেই অগ্রাহ্য করতে পারি না। চেহারা সূরত ও সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের

আকর্ষণ একটা চিরায়ত ব্যাপার। আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে-ই, যার দিকে তাকালে সে তার স্বামীর মনকে আনন্দে ভরিয়ে দেয়, কোনো আদেশ দিলে তার আনুগত্য করে এবং নিজেকে কিংবা তার (স্বামীর) অর্থকে এমন বিষয়ে জড়ায় না যা স্বামী অপছন্দ করে।"[৩৫]

স্ত্রীকে দেখে স্বামীর 'সন্তুষ্ট' হওয়া বলতে মূলত স্ত্রীর মাঝে আল্লাহর আনুগত্য এবং সৎকর্মশীলতা দেখে স্বামীর সন্তুষ্ট হওয়াকেই বোঝানো হয়েছে। তবে স্ত্রীর শারীরিক সৌন্দর্যের মাধ্যমেও স্বামী সন্তুষ্ট হতে পারে। আর এ কারণেই বিয়ের প্রস্তাব প্রদানের সময় নারীর চেহারা দেখে নিতে আদেশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব। একই সাথে পুরুষের উচিত এমন স্ত্রী খোঁজা যে তার উপযুক্ত এবং নারীরও উচিত এমন পুরুষ খোঁজা যে তার উপযুক্ত।

সামঞ্জস্য

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে 'বৈচিত্র্য' এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। বৈষয়িক, আর্থিক, সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক দিকসহ নানা বিবেচনায় মানুষের মধ্যেও নানারকম পার্থক্য আছে। পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রা সচল রাখতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে বলেছেন:

« আমি তোমাদেরকে শ্রেণিগত দিক থেকে কিছু মানুষকে কিছু মানুষের ওপর স্থান দিয়েছি, যেন তোমরা একে অন্যের কাজে লাগতে পারো। (৪৩: ৩২) »

বৈষয়িক এই পার্থক্যের ভিত্তিতে আল্লাহর কাছে কারও মর্যাদার তারতম্য না ঘটলেও এর মধ্য দিয়ে মানুষের মন-মনন, রুচিবোধ, চিন্তা-চেতনা, কর্মপ্রক্রিয়া, জীবনধারা ও আচার-আচরণে পার্থক্য সূচিত হয়। স্বামী-স্ত্রীকে যেহেতু পরস্পরের সাথে জীবনে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে কাটাতে হয়, সেক্ষেত্রে যদি তাদের মধ্যে এসব দিক থেকে বিস্তর পার্থক্য থাকে তা হলে তাদের মধ্যে বোঝাপড়ায় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং তা মনোমালিন্য, ঝগড়া-ফাসাদ, এমনকি বিচ্ছেদের কারণ, হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই উল্লিখিত বিষয়গুলোতে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে একটা সমতা রক্ষা করে চলাই উত্তম।

---

[৩৫] আহমাদ, আন-নাসা'ঈ এবং আল-হাকিম হাদীসটি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৩২৯৮ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৮৩৮)।

হ্যাঁ, তবে যদি কেউ এসব পার্থক্য সত্ত্বেও মানিয়ে চলতে পারে তাতে কোনো সমস্যা নেই। এই বিষয়টির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "তোমরা তোমাদের প্রজননকোষের ব্যাপারে উত্তম সিদ্ধান্ত নাও; সামঞ্জস্য দেখে বিয়ে করো; আর সামঞ্জস্য দেখে (তোমাদের মেয়েদের) বিয়ে দাও।"

তবে খেয়াল রাখতে হবে, এসব বিবেচনা অবশ্যই বিয়ের ক্ষেত্রে মুখ্য নয়। প্রধানতম বিষয় হলো দীন এবং চরিত্র। এসব পার্থক্য যদি এমন বড় হয় যা বিবাহের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যাহত করে দেয় তা হলে তা বিবেচনা করতে হবে। তবে এসব বিষয়কে বিবেচনা করতে গিয়ে কখনো দীন ও উত্তম চরিত্রকে অবমূল্যায়ন করা যাবে না।

আদর্শ পাত্রের বৈশিষ্ট্য

ধার্মিকতা

পাত্রী পছন্দের ক্ষেত্রে যেমন কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজতে বলা হয়েছে, তেমনি পাত্রের বেলাও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে পাত্রের ক্ষেত্রে প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো তার দীনদারী ও চরিত্র।

নবিজি ﷺ দীনদার এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী পুরুষের সাথে তাদের মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের নির্দেশ দিয়েছেন। সৎকর্মশীলতা এবং উত্তম চরিত্রের জন্য প্রশংসিত কোনো পুরুষ কোনো নারীকে বিয়ে করতে চাইলে তার প্রস্তাব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। আবু হুরায়রা, ইবনে 'উমর এবং আবু হাতিম আল-মুযানি ﷺ বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

> "যদি কোনো পুরুষ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তোমার কাছে আসে এবং তুমি তার দীন এবং চরিত্রের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হও, তা হলে তাকে বিয়ে করো—যাতে করে পৃথিবীতে ফিৎনা এবং বড় ধরনের বিপর্যয় ছড়িয়ে না পড়ে।"[৩৬]

উত্তম চরিত্র

কোনো নারী যখন একজন দীনদার এবং উত্তম চরিত্রের কোনো পুরুষকে বিয়ে করে, তখন তার হারানোর কিছুই থাকে না—সে তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখলে উত্তম আচরণের সাথেই তাকে রাখবে; আর সে যদি তাকে তালাক দিতে চায়, তা হলে সেটাও সে

[৩৬] আত-তিরমিযি, ইবনু মাজাহ্ এবং অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৭০ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১০২২)।

উত্তম আচরণের সাথেই করবে। অধিকন্তু, স্বামী দীনদার এবং উত্তম চরিত্রের হলে তা স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি সকলের জন্যই কল্যাণকর। এতে তারা দীনের জ্ঞানার্জন এবং আরও ভালোভাবে দীন পালনের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহায়তা করতে পারবে।

কোনো পুরুষের যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলো না থাকে, তা হলে একজন নারীর উচিত হবে সে পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ না করা। বিশেষ করে যদি সে সালাত আদায়ের ব্যাপারে অবহেলা করে, মদ্যপানে আসক্ত হয়, ব্যভিচারে কিংবা এই ধরনের অন্যান্য বড় পাপে লিপ্ত থাকে। স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অর্থসম্পদ এবং সামাজিক পদমর্যাদা যেন কখনোই একজন নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাপকাঠি না হয়।

আর্থিক অবস্থা

দুঃখের বিষয়, বিয়ের জন্য ছেলে খোঁজার সময় মেয়ের পরিবার বা অভিভাবক ছেলের ঈমান-আকীদা এবং তাকওয়ার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্রথমেই তার অর্থ-সম্পদের দিকে নজর দেয়। অধিকন্তু, আজকের দিনের অধিকাংশ মুসলিম নারীরাও অনৈসলামী মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। অথচ তাকওয়া, উত্তম চরিত্রই কেবল টেকসই ও প্রেমময় দাম্পত্য-সম্পর্কের নিশ্চয়তা দেয়। কিন্তু অধুনা মুসলিম নারীরা এ ধরনের স্বামী আর খোঁজে না। তারা স্বামী হিসেবে এমন পুরুষকে খুঁজে বেড়ায় যে ঐশ্বর্যশালী, যার রয়েছে উচ্চ পদমর্যাদা কিংবা যে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত কোনো বিশেষ ডিগ্রিধারী। আর এমনটি করতে গিয়ে তারা দীন-ধর্ম, নৈতিকতা এবং সর্বোপরি সুখ পর্যন্ত বিকিয়ে দিচ্ছে।

আমরা অবশ্যই মুসলিমদেরকে দারিদ্র্যের মাঝে জীবন কাটানোর আহ্বান জানাচ্ছি না। তবে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলছি, অর্থসম্পদ এমন একটি গৌণ বিষয় যেটাকে কখনোই দীন এবং উত্তম চরিত্রের সমকক্ষ মনে করা উচিত নয়। তা ছাড়া দারিদ্র্য কিংবা সচ্ছলতা কোনো স্থায়ী বিষয় নয়। বিত্তশালী কোনো ব্যক্তি অল্প দিনের মধ্যেই দরিদ্র হয়ে যেতে পারে, আবার দরিদ্র কোনো ব্যক্তিও অল্প সময়ের মধ্যেই সচ্ছল হয়ে যেতে পারে।

আচার-ব্যবহার ও সৌজন্যবোধ

অনেক সময় মানুষের সাধারণ দীনদারী, সালাত, সিয়াম, চরিত্র ঠিক থাকলেও আচার-ব্যবহার ভালো থাকে না। অনেকের ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, বাইরের মানুষদের

সাথে বেশ অমায়িক ব্যবহার করলেও ঘরের মানুষদের সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকে। এ স্বভাবের কারণে নিজেদেরদের সম্পর্কগুলো একেবারে ভেঙে না দিলেও সম্পর্কের মাধুর্য নষ্ট করে দেয়।

ইসলামে যে উত্তম চরিত্রের কথা বলা হয়েছে সেটা কেবলই অশ্লীলতা ও যিনা-ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার কথা বোঝায় না; বরং আচার-ব্যবহারও এর মধ্যে শামিল। কোনো পাত্রের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেওয়ার সময় খেয়াল করুন তার আচার-ব্যবহার কেমন; সে তার পরিবার-পরিজন, অফিস কলিগদের সাথে কীভাবে মেশে; ড্রাইভার, দারোয়ান কিংবা কাজের লোকদের সাথে কেমন আচরণ করে। মুখে হাসি রেখে কথা বলে, নাকি সারাক্ষণ বদমেজাজি হয়ে থাকে।

চেহারা

পুরুষদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টি করেছেন কঠোর কঠিন ও দুরূহ কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কৃষি কাজ করা, বিশাল ভারী বোঝা বহন করা, হাজার ফুট মাটির গভীরে খনিতে নেমে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা, সমুদ্রযাত্রার মতো দুঃসাহসিক কাজ,উঁচু উঁচু ইমারত নির্মাণসহ যত রকম কঠিন কায়িক পরিশ্রমের কাজ আছে এগুলো করা পুরুষের দায়িত্ব। তাই পুরুষের সাধারণ শারীরিক কাঠামোর মধ্যে নারীর মতো কোমলতা, সৌন্দর্য, কমনীয়তা নেই। আল্লাহই পুরুষকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষের সৌন্দর্য তার পৌরুষদীপ্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিহিত। তাই তার চেহারা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে পুরুষের চেহারার সৌন্দর্য তার দাড়ির মধ্যে পাওয়া যায়। বলা হয়ে থাকে 'Beard for a man is like mane for a lion.' অর্থাৎ 'পুরুষের দাড়ি হলো সিংহের কেশরসম'।

মুখে দাড়ি না থাকা একটি নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য। দাড়িবিহীন একজন সুস্থ সবল সুগঠিত চেহারার যুবককে কোমলমতি একজন নারীর সাথেই সামঞ্জস্য আনা যায়। এ জন্য অনেক বিদ্বান লোকেরা দাড়িহীন লোকদের দিকে তাকানোকে কিছুটা নারীদের দিকে তাকানোর সাথে তুলনা করেছেন। তাই পাত্রের চেহারা দেখার ক্ষেত্রে দেখুন তার দাড়ি আছে কি না।

বিয়ের প্রস্তাব

বিয়ের ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্র এবং গুণাবলির কোনো নারীর খোঁজ পাওয়া গেলে পুরুষের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হবে তার অভিভাবকের নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠানো। এই কাজটিকে আমরা 'Proposal' বা 'প্রস্তাব' বা 'খিতবাহ্' বলি। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়েই পছন্দের নারীকে বিয়ে করার চেষ্টা করতে হয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী, আগ্রহী পুরুষ তার পছন্দনীয় নারীর অভিভাবকে সরাসরি প্রস্তাব করতে পারে। অথবা তার কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর মাধ্যমেও প্রস্তাব পাঠাতে পারে। পুরুষের প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে নারীকে তখন পুরুষের 'বাগ্‌দত্তা' বিবেচনা করা হয়। এই 'বাগ্‌দান' আইনগতভাবে কার্যকর কোনো সম্বন্ধ নয়। এটি পূর্ণ এবং আইনসিদ্ধ বৈবাহিক বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে একটি সম্মতি-মাত্র।

যদিও প্রস্তাবে সম্মত হলেই তা বাস্তবায়ন করতে কোনো পক্ষই আইনগতভাবে বাধ্য থাকে না, তবে প্রস্তাবে রাজি হওয়ার মধ্য দিয়ে উভয়পক্ষের মাঝে একটি পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কোনো বৈধ কারণ, ছাড়াই এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা একধরনের অনৈতিক প্রতারণা।

পাত্রীপক্ষ যদি পাত্রের এমন কোনো মারাত্মক সমস্যার কথা জানতে পারে যেটা প্রস্তাবে রাজি হওয়ার সময় তাদের জানা ছিল না, তা হলে পাত্রীপক্ষ প্রস্তাবের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে পারে। একইভাবে, পাত্র যদি পাত্রীর এমন কোনো সমস্যার কথা জানতে পারে যা বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর সময় তাদের জানা ছিল না, তা হলে তারাও সে বিয়ের প্রস্তাব বাতিল করতে পারে। পাত্রের জন্য নিয়ম হলো সে পাত্রীর পিতার নিকট কিংবা পিতা না থাকলে তার নিকটতম অভিভাবকের নিকট বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাবে।

কোনো কোনো অঞ্চলে এমন একটি বিদ‘আতী প্রথা রয়েছে, কোনো পুরুষ কোনো নারীকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব করলে নারীর পরিবার যদি প্রস্তাবে রাজি হয়, তা হলে

সকলেই দুহাত তুলে ফাতিহা পাঠ করে। এটি একটি বিদ'আত, কারণ, সুন্নাহ্তে এর কোনো ভিত্তি নেই; আবার সালাফদের রীতি থেকেও এটা প্রমাণিত নয়।

পাত্রী দেখা

কোনো পুরুষ কোনো নারীকে বিয়ে করার মনস্থ করলে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের প্রস্তাব পাঠানোর পূর্বেই নারীকে দেখার অনুমতি আছে; বরং দেখে নিতে উৎসাহিত করা হয়েছে। তবে ততটুকুই দেখা যাবে যতটুকু স্বাভাবিকভাবে দেখা সম্ভব। এটা পুরুষকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে। ফলে সে নিশ্চিত হতে পারবে, সে তার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর চেহারা-সৌন্দর্য নিয়ে সন্তুষ্ট এবং তাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে উদ্‌গ্রীব কি না।

মুগীরাহ ইব্‌ন শু'বাহ ﷺ বর্ণনা করেন, তিনি একবার এক নারীকে বিয়ে করতে মনস্থ করেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তা শুনে তাকে বলেন:

> "তুমি গিয়ে তাকে দেখে এসো, এটা তোমাদের মধ্যে হৃদ্যতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করবে।"
>
> এরপর তিনি পাত্রীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়ে পাত্রীর পিতা-মাতাকে বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বলেছেন তাকে দেখতে।" তারা তো তার কথা শুনে হতভম্ব। মেয়েটি তখন ভেতরবাড়িতে ছিল। সেখান থেকে সে বলে, "আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ যদি সত্যিই আপনাকে আমায় দেখতে বলে থাকেন তা হলে এই যে আমি, দেখে নিন; আর যদি তিনি না বলে থাকেন তা হলে আপনি কিছুতেই আমার দিকে তাকাবেন না।" তিনি তখন তার দিকে তাকান এবং তাকে বিয়ে করেন। মুগীরা ﷺ পরবর্তী সময়ে বলেন, "(ভালোবাসার দিক থেকে) তার অবস্থান আর কেউই অর্জন করতে পারেনি, যদিও আমি সত্তরের অধিক নারীকে বিয়ে করেছি।"[৩৭]

মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ্ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যদি কোনো ব্যক্তির মনে কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব করার ইচ্ছে হয়, তা হলে তার জন্য সে নারীকে দেখার মধ্যেকোনো অসুবিধা নেই।"[৩৮]

জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন:

---

[৩৭] মুসনাদ আহমাদ, মুসতাদরাক হাকিম। আলবানি সহীহ সাব্যস্ত করেছেন, আস সহীহাহ হাদীস নং ৯৬

[৩৮] ইবনু মাজাহ্ এবং আহমাদসহ অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস ৯৮)।

> "তোমাদের কেউ যখন কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দাও, তখন তার উচিত তাকে দেখে নিতে চেষ্টা করা; যেন তা তাকে বিয়ে করতে আরও আগ্রহী করে তোলে এবং সে বিয়ে করে ফেলে।"
>
> জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ্ বলেন, "এরপর আমি একবার এক নারীকে বিয়ে করার আগ্রহ পোষণ করলাম। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে দেখতে থাকলাম, একপর্যায়ে এটা আমাকে বিয়ের দিকে নিয়ে গেল।"[৩৯]

আবু হুমায়েদ আস সা'দী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

> "তোমরা যখন কোনো নারীকে বিয়ের জন্য প্রস্তাব দাও, তখন তার দিকে তাকানোতে কোনো গুনাহ নেই; যদি সত্যি সে বিয়ে করার ইচ্ছে পোষণ করে—এমনকি যদি সে (নারী) বিষয়টি না-ও জানে।"[৪০]

ঠিক যেমন একজন পুরুষ তার ভবিষ্যৎ স্ত্রীকে দেখতে পারবে, একজন নারীও তার ভবিষ্যৎ স্বামীকে দেখতে পারবে এবং তার ক্ষেত্রেও উল্লিখিত শর্তগুলো প্রযোজ্য। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, পুরুষের আওরাহ্ হলো তার নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত। অবশ্য, পুরুষের মতো না হয়ে, নারীর দৃষ্টিতে যেন তার সলজ্জ সংকোচ ফুটে ওঠে। কারণ, তা হলো স্বাভাবিক নারীসুলভ আচরণের পরিচায়ক।

কোনো নারীর দিকে একাগ্রচিত্তে দৃষ্টি দেওয়া পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ, যদি না সে নারী সেই পুরুষের মাহ্‌রাম কেউ হয়। তবে বিয়ের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো নারীর দিকে তাকালে সেটি হবে এই হুকুমেরর সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম এবং এ ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে:

- নারীর দিকে যে কেউ এমনিতেই তাকায় আর যে পুরুষ বিয়ের উদ্দেশ্যে তাকায় এদের মধ্যে পার্থক্য হলো—দ্বিতীয় জনের তাকানো বৈধ এবং সে পুনরায় তাকাতে পারে, কিন্তু প্রথ মজনের তাকানো বৈধ নয়।
- এই তাকানো হতে হবে সত্যিকারে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে; নিজের কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য নয়।
- বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে নারীর পরিবার সে প্রস্তাবে রাজি হলে পরে এ কথা জেনেই কেবল বিয়ের উদ্দেশ্যে সে নারীর দিকে তাকানো যাবে।

---

[৩৯] সুনান আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ। আলবানি সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

[৪০] মুসনাদ আহমাদ ও মু'জাম কাবীর। আলবানি সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

* কোনো রকম স্পর্শ করা বা খাল্‌ওয়াহ্‌ (নারীর সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ করা) ব্যতিরেকে কেবল দেখা বা তাকানো যাবে।
* শরীরের সে অংশগুলোই কেবল দেখা যাবে যেগুলো একজন নারীর জন্য কোনো অপরিচিতের সম্মুখে খোলা রাখা বৈধ। অর্থাৎ, তার মুখমণ্ডল এবং কব্জি পর্যন্ত দুহাত।
* রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় জানা-অজানা নির্বিশেষে সকল নারীদের প্রতি বিয়ের ইচ্ছেকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে তাকানো বৈধ নয়।

কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ আমাদের উল্লিখিত সর্বনিম্ন পরিসীমার বাইরেও পুরুষকে পাত্রী দেখার অনুমতি দেন। আমরা অনেকগুলো কারণে এই মতকে সমর্থন করি না। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কারণটি তা হলো—অন্তরে যাদের ব্যাধি আছে সেসব পুরুষদের জন্য এটা একটা মওকা। ফলে খুব সহজেই তারা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের কামনা চরিতার্থ করার মাধ্যমে সরল ও কোমলমতি নারীদের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

পাত্র যদি মনে করে, তার পছন্দের পাত্রীকে ভালোমতো দেখা হয়নি এবং পাত্রী সম্পর্কে তার ধারণা স্বচ্ছ নয়; তা হলে পাত্রীকে ভালোভাবে দেখার জন্য সে তার কোনো নারী আত্মীয়কে পাঠাতে পারে এবং সে আত্মীয় তাকে পাত্রী সম্পর্কে অবগত করাতে পারে।

ছবি আদান-প্রদান

আলোকচিত্রের ব্যাপক ছড়াছড়ির এই যুগে প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয়—বিবাহে আগ্রহী নারী-পুরুষ তাদের ছবি আদান-প্রদান করতে পারবে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আমাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন:

* জীবিত প্রাণীর আলোকচিত্র বা ছবি ইসলামে এমনিতেই নিষিদ্ধ। কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ কোনো মাসলাহাহ্‌ (উপকার) পাওয়া গেলেই এবং ভিন্ন কোনো উপায়ে ওই উদ্দেশ্য পূরণ না হলেই কেবল মুসলিমদের জন্য ছবি তোলার হুকুম রয়েছে।
* এমনকি যদিও কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে ছবি তোলা অনুমোদিত হয়, তারপরও ছবিতে নিষিদ্ধ কিছুকে দেখানো যাবে না। যেমন, পূর্ণ পর্দা না করা কোনো নারীর ছবি।

- বিয়ের পাত্র যখন পছন্দের পাত্রীর দিকে তাকায়, তখন কিন্তু পাত্রী বা তার ওয়ালী তার দৃষ্টিকে সংযত করতে পারে। যাতে করে পাত্রীর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘিত না হয় বা কোনো রকম সীমালঙ্ঘন না হয়। কিন্তু, ছবির দিকে পাত্র চাইলে যতক্ষণ খুশি তাকিয়ে থাকতে পারে। যাদের দেখার কথা না, তাদেরকেও দেখাতে পারে। কিংবা বিয়ে না হলেও সেই ছবি নিজের কাছে রেখে দিতে পারে। এতে সেই নারীটির বিরাট ক্ষতি হয়ে যায়। যে কেউ চাইলেই তখন তার ছবিটি দেখতে পারবে।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর কারণেই ছবি আদান-প্রদান করা বৈধ বা অনুমোদিত নয়। তবে পরিস্থিতি যদি এমন হয়, পাত্রীর কোনো মাহ্‌রাম পাত্রকে ছবিটি দেখায়, তা হলে তা করা যেতে পারে। তবে পাত্রীর ছবি পাত্রের কাছে রেখে দেওয়া যাবে না।

কথা বলা এবং যোগাযোগ রাখা

বিয়ের জন্য পাত্রীকে একান্তভাবে নির্বাচিত করলে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে কথা বলা এবং যোগাযোগ রাখার অনুমতি রয়েছে। তবে এটি হতে হবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের অধীনে অর্থাৎ পাত্রীর অভিভাবক অথবা পাত্রের প্রতিনিধির উপস্থিতি ও নজরদারিতে। নির্জনে সাক্ষাৎ করা কিংবা একান্তে একাকী কথা বলা যাবে না, কোনো রকম স্পর্শ বা সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। কথাবার্তা এবং যোগাযোগ কেবল সেই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে যা পাত্র-পাত্রীকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

ইন্টারনেটে পাত্রী খোঁজা

বর্তমান যুগে যোগাযোগের সর্বাধুনিক এবং সবচেয়ে শক্তিশালী একটি মাধ্যম হলো ইন্টারনেট। প্রয়োজনীয় তথ্য খোঁজা, পড়াশোনা, লেখালেখি, জ্ঞানার্জন, চ্যাট করা, কেনাকাটা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে একজন সাধারণ মানুষ ইন্টারনেট ঘেঁটে অনেক সময় ব্যয় করে থাকে। ফলে, অনেকেই ইন্টারনেটের বিচিত্র এই দুনিয়ায় পাত্র বা পাত্রীও খোঁজেন! এখানে নারী-পুরুষের মধ্যে 'আলাপ' চলে, ই-মেইল বিনিময় হয়, এমনকি ডিজিটাল ছবিও তারা আদান-প্রদান করে!

যাই হোক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইন্টারনেটে প্রস্তাব দিয়ে বিয়ে করার রয়েছে নেতিবাচক পরিণাম। এই প্রক্রিয়ায় অনেক মিথ্যাচার, আপত্তিকর ও নিষিদ্ধ আচরণ

সংঘটিত হয়—ইসলামের দৃষ্টিতে যেগুলো নির্জলা পাপ। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

- প্রত্যেকেই বিপরীত পক্ষকে প্রভাবিত করার জন্য নিজেদের সম্পর্কে এক মিথ্যা চিত্র তুলে ধরে। নিজে যেমনটি হলে ভালো হয় সেভাবেই একজন আরেক জনের কাছে নিজেকে উপস্থাপন করে। বাস্তবে কে কেমন তা কেউ উপস্থাপন করে না। একটি কিবোর্ড আর একটি মনিটর নিয়ে ঘরের মধ্যে একাকী হওয়ায় নিজের সম্পর্কে মিথ্যা বর্ণনা দেওয়ার সুযোগ থাকে। সে কারণেই এই ধরনের যোগাযোগে মিথ্যাচার এবং প্রতারণার আশঙ্কা অনেক বেশি।
- পাত্রের পরিবার, তার বন্ধুবান্ধব, আচার-আচরণ, তার আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয়ার দায়িত্ব সাধারণত নারীর অভিভাবকের। কিন্তু ব্যাপারটি ইন্টারনেটে ঘটলে সেক্ষেত্রে নারী উল্লিখিত বিষয়গুলো বর্জন করে নিজেই নিজের চূড়ান্ত কর্তাব্যক্তি হয়ে যায়। ফলে নিজের আবেগ, অদূরদর্শিতা আর পাত্রের চাতুর্য মিলে তৈরি হয় পুরো জিন্দেগীর এক অন্যতম ভুল সিদ্ধান্ত!
- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিজিটাল ছবির আদান-প্রদান হয়ে থাকে। এটা নিষিদ্ধ; পর্দার খেলাপ; পাপ। কারণ,, ডিজিটাল ছবি খুব সহজেই এবং স্থায়ীভাবে কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা যায় এবং 'আগ্রহী'-দের মাঝে হাতবদল হতে পারে।

উল্লিখিত কারণগুলোসহ আরও অনেক কারণেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিয়ের চেষ্টা করা একটি বিপজ্জনক পন্থা যা সৎকর্মশীল মুসলিমদের জন্য অবশ্যই বর্জনীয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইস্তেখারাহ্ করা

ইস্তেখারাহ্ বলতে আল্লাহর প্রতি নিজের পূর্ণ আস্থা স্থাপনের মাধ্যমে কল্যাণ এবং মঙ্গল অন্বেষণ করাকে বোঝায়। একজন মু'মিনের উচিত যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়ার পূর্বে ইস্তেখারাহ্ সালাত আদায় করা। যেহেতু বিয়ের সিদ্ধান্তটা একজন মানুষের জীবনে এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত, তাই বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে পাকা কথা দেওয়ার পূর্বে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ইস্তেখারাহ্ সালাত আদায় করা সমীচীন। তবে ইস্তেখারাহ সম্পর্কে মানুষের মাঝে এমন কিছু ভুল ধারণা রয়েছে যেগুলো থেকে সচেতন থাকা প্রয়োজন, যেমন:

- ইস্তিখারাহ্ সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা হলো—যদি কেউ দুই বা ততোধিক বিকল্প পন্থার মধ্যে কোনটি গ্রহণ করলে উত্তম হবে সে বিষয়ে অনিশ্চয়তায়

ভোগে, তা হলে এই সালাত আদায় করা হয়। অথচ হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট, ব্যক্তি বিকল্প পন্থাগুলোর কোনটি গ্রহণ করবে তা সিদ্ধান্ত নেয়ার পরেই কেবল এই সালাত আদায় করতে হবে।

- অনেকে মনে করেন, ইস্তেখারাহ্ সালাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো এই সালাত ঘুমোতে যাওয়ার ঠিক পূর্বে আদায় করতে হবে এবং কী করলে ভালো হবে সে ব্যাপারে স্বপ্নের মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।
- অনেকে আবার মনে করেন, ইস্তেখারাহ্ সালাত সঠিক সিদ্ধান্তের প্রতি অন্তরে টান সৃষ্টি করবে।

এই ধরনের অনুমান-ভিত্তিক কথাবার্তার কোনোই ভিত্তি নেই এবং এগুলোর কোনোটিই হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়।

পরামর্শ করা

ইস্তেখারাহ্ করা ছাড়াও কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে প্রবীণ ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। বিয়ের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের জন্য তাদের সম্ভাব্য জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনীর ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়াকে উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে নিশ্চিত হওয়া যায়, পাত্র এবং পাত্রীর মধ্যে প্রয়োজনীয় সদ্‌গুণগুলো রয়েছে কি না।

বিয়ে কিংবা ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এমন কারও সম্পর্কে কোনো ব্যক্তির কাছে তথ্য, উপদেশ বা পরামর্শ চাওয়া হলে, সেই ব্যক্তির উচিত তার সম্পর্কে সত্য বলা এবং সদুপদেশ প্রদান করা। যে ব্যাপারে জানতে চাওয়া হয়েছে কেবল ওই ব্যাপারেই তথ্য-পরামর্শ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। অপ্রাসঙ্গিক কোনো কথা বলা যাবে না; কারণ, তা পরচর্চার মতো নিষিদ্ধ কাজ বলে গণ্য হবে।

সত্য জানানো

বিয়ের উভয় পক্ষের সম্বন্ধে পরস্পরকে সঠিক তথ্য প্রদান করা জরুরি। তথ্য সেসব ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত যে ব্যাপারগুলো বিয়ের জন্য প্রয়োজন বলে মনে হয়। সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষ যেমন: পাত্র-পাত্রী, তাদের প্রতিনিধিগণ এবং এমন কেউ যাদের কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়, তাদের সকলের কাছ থেকেই পুরোপুরি সঠিক তথ্য পাওয়াটা উচিত। কেউ কোনো সমস্যার কথা গোপন করলে ইসলামের দৃষ্টিতে তা

হবে সত্যকে গোপন করার মতো পাপকাজ। যা ভবিষ্যতে পাত্র-পাত্রী উভয়ের জন্যই সমস্যার কারণ, হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, বিয়ের কথাবার্তা চলছে এমন পাত্র-পাত্রীর কারও যদি কোনো শারীরিক সমস্যা থাকে, তা হলে তা অবশ্যই জানিয়ে দিতে হবে। যদি পাত্র বা পাত্রী দুজনের কারও কোনো শারীরিক অক্ষমতা যেমন: ধ্বজভঙ্গ, যৌন রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি থাকে, তা হলে চূড়ান্ত বাগ্‌দানের পূর্বেই তা অপর পক্ষকে অবহিত করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে একজন অপর জনের কোনো সমস্যার কথা জানতে পারলে, সেই সমস্যার কথা গোপন রাখা হবে একজন ঈমানদার সৎকর্মশীল লোকের কাজ; কোনোভাবেই তা মানুষের মাঝে প্রচার বা প্রকাশ করা তার জন্য বৈধ নয়।

নিষিদ্ধ প্রস্তাব

বিবাহিতা নারীকে প্রস্তাব না দেওয়া

বিবাহিতা কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ওই নারীর ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য যার স্বামী তাকে প্রথম বা দ্বিতীয় তালাক (চূড়ান্ত নয়) দিয়েছে এবং সে এখনো ইদ্দতের মধ্যে রয়েছে। কারণ, হলো, এ ক্ষেত্রে নারীকে তার স্বামীর কর্তৃত্বাধীন বলে বিবেচনা করা হয় এবং অন্য কোনো পুরুষ উক্ত স্বামীর এই অভিভাবকত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতে পারে না।

কারও প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব না দেওয়া

ইতিপূর্বে কোনো মুসলিম পুরুষ কোনো মুসলিম নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, এমতাবস্থায় অন্য কোনো মুসলিমের জন্য সেই নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া বৈধ নয়। প্রথম প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক আর প্রত্যাখ্যান করাই হোক—যতক্ষণ পর্যন্ত নারীর পক্ষ থেকে প্রথম প্রস্তাবের ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট মতামত না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। পূর্বজনের প্রস্তাব নাকচ করা হলে পরে অন্যরা প্রস্তাব নিয়ে যেতে পারবে। আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে নারীকে তোমার (কোনো মুসলিম) ভাই (বিয়ের) প্রস্তাব করেছে, তোমাদের কেউ যেন তাকে প্রস্তাব না করে। অপেক্ষা করো যতক্ষণ না সে বিয়ে করে ফেলে অথবা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে।"[৪১]

অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ

বিয়ের প্রস্তাব করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কাজগুলোও নিষিদ্ধ:

- কোনো ব্যক্তির চার জন স্ত্রী থাকলে সে আর কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারে না; যতক্ষণ না স্ত্রীদের এক বা একাধিক জনকে সে তালাক প্রদান করে।
- পুরুষ এমন কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারে না যাকে বর্তমান স্ত্রীর সাথে একত্রে বিয়ে করা হারাম। যেমন: বর্তমান স্ত্রীর বোন, খালা, ফুপু ইত্যাদি।
- কোনো ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে বিচ্ছেদে চলে যায়, সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি তার এই প্রাক্তন স্ত্রীকে আর বিয়ের প্রস্তাব দিতে পারবে না। তবে যদি তার সেই প্রাক্তন স্ত্রীর অন্য কোথাও বিয়ে হয় এবং সেখান থেকে পুনরায় তালাকপ্রাপ্তা কিংবা বিধবা হয় তারপর আবার প্রস্তাব দিতে পারবে।
- স্বামীর মৃত্যু কিংবা চূড়ান্ত তালাক[৪২] প্রাপ্তির পর যে নারী ইদ্দতের মধ্যে রয়েছে, তার ইদ্দত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার কাছে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাওয়া অনুচিত। তবে তাকে আকার- ইঙ্গিতের মাধ্যমে আভাস দেওয়া যেতে পারে।

অধীনস্থ নারীর জন্য বিয়ের প্রস্তাব প্রদান

নিজ কন্যা কিংবা অভিভাবকত্বের অধীন কোনো নারীর বিয়ের জন্য কাউকে প্রস্তাব দেওয়া বৈধ। আব্দুল্লাহ ইবন 'উমার বর্ণনা করেন, তার বোন হাফসার স্বামী খুনায়স ইবন হুযাফাহ আশ শামী মারা যাওয়ার পর 'উমার উসমানকে প্রস্তাব দেন হাফসাকে বিয়ের জন্য। কয়েক দিন পর 'উসমান অপারগতা জানিয়ে বলেন, 'আমি এই মুহূর্তে বিয়ের কথা ভাবছি না।' 'উমার তারপর গিয়ে আবু বাক্রকে প্রস্তাব দেন, কিন্তু তিনি

---

[৪১] আন-নাসা'ঈ হাদীসটি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া' আল-গালীল, হাদীস ১০৩০)।

[৪২] তৃতীয় এবং চূড়ান্ত তালাক অথবা খুল' (নারীর অনুরোধ) বা ফাসখ (বিচারকের আদেশ) এর মাধ্যমে বিবাহ-বিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত।

কোনো জবাবই দিলেন না। এতে 'উমার বেশ মনঃকষ্ট পান। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এই বলে সান্ত্বনা দেন, "হাফসা উসমানের চেয়ে উত্তম কারও সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং 'উসমান হাফসার চেয়ে উত্তম কাউকে বিয়ে করবে।" এর মাত্র ক'দিন পর আল্লাহর রাসূল ﷺ নিজে হাফসাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং 'উমার তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে নেন। পরে আবু বাক্‌র উমারের সাথে দেখা করে বলেন, 'আপনি হাফসার বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমি কোনো জবাব না দেওয়ায় সম্ভবত আপনি কষ্ট পেয়েছেন।' 'উমার বলেন, 'হ্যাঁ।' আবু বাক্‌র رضي الله عنه তার কারণ, ব্যাখ্যা করে তখন বলেন, 'আমি আপনার প্রস্তাবের কোনো জবাব না দেওয়ার কারণ, ছিল—আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে তার কথা উল্লেখ করতে শুনেছি; আর আমি চাচ্ছিলাম না আল্লাহর রাসূলের গোপনীয়তা প্রকাশ করে দিতে। তিনি যদি তাকে বিয়ে না করতেন তবে আমি অবশ্যই প্রস্তাব গ্রহণ করতাম।'[৪৩]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে কুরআনে আরও এক নেক্‌কার বান্দার ঘটনা শুনিয়েছেন যেখানে তিনি তার দুই কন্যার এক কন্যাকে নবিজি মূসা (আ.)-এর সাথে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। এ ঘটনা উল্লেখ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

> « সে (মূসাকে) বলল, আমি তোমার কাছে আমার এই দুই মেয়ের একজনকে এই শর্তে বিয়ের প্রস্তাব করছি, (এর বিনিময়ে) আট বছর তুমি আমাকে মজুর (শ্রম) দেবে; আর তুমি যদি দশ বছর পূর্ণ করো সেটা তোমার ব্যাপার। তবে আমি তোমার ওপর কোনো বোঝা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছি না। তুমি আমাকে ইনশা আল্লাহ সৎকর্মশীলদের দলভুক্তই পাবে। »[৪৪]

বাগ্‌দানের আংটি ও স্বর্ণালংকার

বাগ্‌দত্তা যুগলদের মাঝে প্রায়ই 'বাগ্‌দানের আংটি' বদল হয় এবং পাত্র বিয়ের কথাবার্তা চলার সময় পাত্রীকে স্বর্ণালংকারসহ নানা ধরনের উপহার সামগ্রী দিয়ে থাকে। এমনটি করা ইসলামের পরিপন্থী। কারণ, এই মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের মাঝে কোনো ধরনের সম্পত্তি বা উপহার সামগ্রী বিনিময়ের কোনো বৈধ কারণ, নেই- যতক্ষণ না তারা শার'ঈ বিধান মতে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের

[৪৩] সহীহ আল বুখারী, সুনান আন নাসায়ী।

[৪৪] সূরা কাসাস, ২৮:২৭।

অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ড উভয়ের মাঝে মারাত্মক বিবাদের কারণ, হয় যদি কোনো কারণে বাগ্‌দান ভেঙে যায়।

অধিকন্তু, ইসলামে এই বাগ্‌দান আংটি বদলের কোনো ভিত্তি নেই। এই চর্চার উদ্ভব হয়েছে এক প্রাচীন খ্রিষ্টীয় প্রথা থেকে যা মুসলিমদের অনুকরণ করা উচিত নয়।

বাগ্‌দান পার্টি

অনেক মুসলিম সমাজে বাগ্‌দান পর্বটিকে বেশ ধুমধাম করে অতিথি অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করা হয়। এখানে বিভিন্ন ধরনের নিষিদ্ধ পানীয় পরিবেশন করা হয়; গান-বাজনার ব্যবস্থা করা হয়; পাত্র পাত্রীকে চুম্বন করে; একসাথে ছবি তোলে। এগুলোর সবকিছুই সুন্নাহ্ ও ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অতএব এগুলো পুরোপুরি বর্জনীয়।

অধিকন্তু, বাগ্‌দানের এই পর্বটি লোকজনের অগোচরে হওয়া উচিত। কারণ, শার'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের আয়োজনের কোনো তাৎপর্য নেই। বাগ্‌দানের বিষয়টি লোক জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর যদি কোনো কারণে তা বিয়ে পর্যন্ত না গড়ায়, তা হলে এর পরিণতি হতে পারে বেশ লজ্জাকর, যা বিশেষ করে পাত্রীর সুনাম ক্ষুণ্ণ করতে পারে।

বাগ্‌দত্তা দম্পতির নির্জন অন্তরঙ্গতা

কিছু মুসলিম বিয়ের প্রস্তাবের আনুষ্ঠানিকতার মাঝে অনেক অনৈসলামিক বিষয় চালু রয়েছে। এগুলোর অধিকাংশের উদ্ভব ঘটেছে বিজাতীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ থেকে। পরবর্তী অংশে এমনই কিছু বিষয় আমরা উল্লেখ করব।

বাগ্‌দানের পরে এবং বিয়ের পূর্বে, নারীর পরিবার নারীকে তার বাগ্‌দত্তার সাথে বাইরে ঘুরতে যাওয়ার, নির্জনে দেখা করার, এমনকি চুম্বন-আলিঙ্গন করারও অনুমতি দিয়ে দেয়। অনেকেই বাগ্‌দানকে গাড়ি কেনার আগেই তা 'চালিয়ে দেখা'র পর্ব বলে ভেবে থাকে। জীবনের দীর্ঘ একটা সময় একসাথে কাটানো যাবে কি না বুঝে ওঠার জন্য তারা এই সময়টাতে নিজের সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে পূর্ণমাত্রায় বাজিয়ে দেখে। এমনটি করতে গিয়ে তারা যিনা-ব্যভিচারসহ ছোটবড় অনেক পাপে লিপ্ত হয়। আর মজার ব্যাপার হলো, এই ধরনের অনেক বাগ্‌দান ভেস্তে যেতে দেখা যায় এবং বিয়ের আগেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়!

কোনো কোনো পরিবার বাগ্‌দানের পর এবং বিয়ের আগের সময়টাকে কয়েক মাস এমনকি কয়েক বছর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করে থাকে। ফলে বাগ্‌দত্তা যুগলের পাপে লিপ্ত হওয়ার পরিমাণ আরও বেড়ে যায়।

আক্‌দ অনুষ্ঠান

একটি আদর্শ পরিবার গঠনের লক্ষ্যে একজন নারী ও একজন পুরুষের মাঝে বিয়ের (নিকাহ্) চুক্তিনামা সম্পাদিত হয়। বিয়ের চুক্তিনামা হলো সেই আনুষ্ঠানিক বন্ধন যার মাধ্যমে দুজন অপরিচিত মানুষ একে অপরের স্বামী-স্ত্রীতে পরিণত হয়। এই চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার মধ্য দিয়ে অনেক দায়িত্ব এবং কর্তব্য পরস্পরের প্রতি অপরিহার্য হয়ে যায় এবং তা থেকে অনেক সুফল প্রত্যাশা করা হয়।

অনেক মানুষের কাছে বিয়ের এই চুক্তিটি তাদের জীবনের অন্যান্য অনেক চুক্তির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ,, প্রতিটি বৈবাহিক চুক্তিরই রয়েছে সুদূরপ্রসারী প্রভাব। তাদের এই চুক্তির মাধ্যমে তাদের থেকেই আগামী দিনে পৃথিবীতে আগমন করে ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম। বিয়ের এই চুক্তিনামার এহেন গুরুত্বপূর্ণ এবং সুগভীর তাৎপর্যের কারণে ইসলাম এ ব্যাপারে বেশ কিছু নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছে যেগুলো অবশ্য পালনীয়। এই নীতিমালাসমূহই হচ্ছে এ অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়বস্তু।

বিয়ে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটিকে গুরুত্বের সাথেই বিবেচনা করতে হবে। প্রথমে বিয়ে করে পরে বলবে, আসলে সেই অর্থে বিয়ে করিনি বা শুধু মজা করার জন্য করেছিলাম—এই জাতীয় কাজ পুরুষের জন্য বৈধ নয়। আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> “তিনটি বিষয় আছে যেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ এবং অগুরুত্বপূর্ণ উভয় আলোচনাতেই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়—বিয়ে, তালাক এবং প্রত্যাবর্তন (সেই স্ত্রীকে যাকে চূড়ান্ত তালাক দেওয়া হয়নি)।” [৪৫]

---

[৪৫] হাদীসটি আবূ দাউদ এবং আত-তিরমিযিসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৮২৬ এবং সহীহুল জামে', হাদীস নং ৩০২৭)।

ইসলামিক বিয়ের চুক্তিনামায় থাকে ছয়টি শর্ত, দুটি স্তম্ভ, একটি ওয়াজিব এবং একটি ঐচ্ছিক বিষয়। এর কোনো একটি শর্ত বা স্তম্ভ বাদ পড়লে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ত্যাগ করলে পাপ হবে।

শর্তসমূহ:

- পাত্রের উপযুক্ততা
- পাত্রীর উপযুক্ততা
- পাত্রের সম্মতি
- পাত্রীর সম্মতি কিংবা অনুমতি
- ওয়ালীর অনুমোদন
- দুজন সাক্ষীর উপস্থিতি।

স্তম্ভসমূহ:

- ওয়ালীর কন্যা সমর্পণ (ইজাব)
- পাত্রের স্ত্রী কবুল (কবুল)

ওয়াজিব: মোহ্‌র

ঐচ্ছিক বিষয়: আরোপিত শর্তসমূহ।

পাত্রের উপযুক্ততা

বিয়ের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হতে হলে পাত্রকে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে:

- পাত্রকে অবশ্যই মুসলিম পুরুষ হতে হবে।
- অবৈধ যৌনাচার থেকে মুক্ত হতে হবে; অর্থাৎ ব্যভিচারী হতে পারবে না। তবে যদি কেউ সেই পথ থেকে তাওবা করে ফিরে আসে তা হলে তাকে বিয়ে করতে কোনো সমস্যা নেই।
- সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে; অর্থাৎ পাগল কিংবা অপ্রকৃতিস্থ হতে পারবে না।
- সাবালক হতে হবে; অর্থাৎ নাবালক হতে পারবে না। ইসলামে ছেলেদের সাবালকত্ব নির্ধারিত হয় তিনটি আলামতের যেকোনো একটি প্রকাশিত হওয়ার দ্বারা। (ক) যৌন উত্তেজনার সাথে বীর্যপাত হওয়া, (খ) লজ্জাস্থানের পাশে লোম গজানো, (গ) পনেরো বছরে পা দেওয়া।

- রক্ত, দুধ কিংবা বৈবাহিক সম্পর্কের দিক থেকে পাত্র-পাত্রীর সাথে এমন কোনো সম্পর্ক না থাকা, যার কারণে তাদের মধ্যে বিয়ে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয়।
- বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে পাত্রীকে বিয়ে করা সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায় এমন কোনো পরিস্থিতির অধীনে না থাকা। যেমন এক বোন স্ত্রী হিসেবে থাকা অবস্থায় তার অন্য বোনের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি সে মারা যায় কিংবা তার সাথে বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়, তা হলে অন্য বোনকে বিয়ে করা বৈধ।
- অবশ্যই কোনো রকম চাপে না পড়ে, স্বেচ্ছায় চুক্তিনামা সম্পাদন করা।

পাত্রীর উপযুক্ততা

বিয়ের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হতে হলে পাত্রীকে নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে:

- পাত্রীকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে; তবে সতী-সাধ্বী খ্রিষ্টান বা ইহুদি হলেও চলবে।
- অবৈধ যৌনাচার থেকে মুক্ত হতে হবে; অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হতে পারবে না। তবে যদি কেউ সেই পথ থেকে তাওবা করে ফিরে আসে তা হলে তাকে বিয়ে করতে কোনো সমস্যা নেই।
- সুস্থ মস্তিষ্কের হতে হবে; পাগলিনি বা অপ্রকৃতিস্থ হতে পারবে না।
- বর্তমানে কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ না থাকা কিংবা স্বামীর মৃত্যু কিংবা তালাকজনিত কারণে ইদ্দতের মধ্যে না থাকা।
- প্রস্তাবদাতা পাত্রের সাথে রক্ত, দুধ কিংবা বৈবাহিক কোনো সম্পর্কের কারণে বিয়ে নিষিদ্ধ না হওয়া।
- বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে প্রস্তাবদাতা পাত্রের সাথে বিয়ে করা সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ না হওয়া।
- অবশ্যই কোনো রকম চাপে না পড়ে, স্বেচ্ছায় চুক্তিনামা সম্পাদন করা।

পাত্রীর অনুমতি

যাদের মধ্যে বিয়ের চুক্তিনামা সম্পন্ন হয় সেই দুজনের একজন হলো পাত্রী। যে পাত্রের সাথে সে এক সুদীর্ঘ বন্ধনে আবদ্ধ হবে সেই ব্যক্তিটি সম্পর্কে তার কিছু জানার ও বলার থাকতে পারে। বিয়ের চুক্তিনামায় পাত্রীর অনুমতি একটি অত্যাবশ্যকীয়। তার সম্মতি ছাড়া চুক্তিনামা হয় বাতিল, না হয় পাত্রীর ইচ্ছের ভিত্তিতে ইসলামী কর্তৃপক্ষের

মধ্যস্থতায় তা বাতিল হয়ে যেতে পারে।

পরিস্থিতি অনুযায়ী পাত্রীর সম্মতি প্রকাশের ধরন বিভিন্ন রকম হতে পারে। সে মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে তার সম্মতির কথা জানাতে পারে; আবার নীরব থেকে ওয়ালীর সিদ্ধান্তের প্রতিও তার সম্মতি জ্ঞাপন করতে পারে।

কুমারী পাত্রী হলো সেই নারী যার সাথে কোনো পুরুষের কখনো দৈহিক মিলন হয়নি। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় যে তার কৌমার্য অক্ষত; তবে এটি কোনো চূড়ান্ত শর্ত নয়। কারণ, অসুস্থতার কারণে অথবা দুর্ঘটনাবশত অনেক কুমারী মেয়ের সতীচ্ছেদ হয়ে যায়।

কুমারী মেয়েরা সাধারণত সরলমতি হয়। পৃথিবীর রূঢ় বাস্তবতা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকে অপ্রতুল। পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কেও এরা থাকে অনভিজ্ঞ। পুরুষদের ব্যাপারে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় ভবিষ্যৎ জীবন-সঙ্গীকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তারা হয় অনভিজ্ঞ। কাজেই এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া একজন কুমারীর পক্ষে সম্ভব হয় না; তাই সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারটি তার ওয়ালীর উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়। ওয়ালী হিসেবে সাধারণত পাত্রীর পিতা তার কন্যার পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। ওয়ালী সিদ্ধান্ত নিলেও বিয়ের চুক্তিনামা সম্পাদনের পূর্বে ওয়ালীকে অবশ্যই পাত্রীর সাথে পরামর্শ করে তার সম্মতি নিতে হবে।

কুমারী যদি অতি সম্ভ্রম ও লাজুক প্রকৃতির হয়, যা ছিল আগের দিনের মুসলিম কুমারীদের বৈশিষ্ট্য, তা হলে সে পাত্রের ব্যাপারে মুখ ফুটে কিছু বলতে বেশ জড়তা বোধ করতে পারে। এমন ক্ষেত্রে তার মৌন সম্মতিই যথেষ্ট। পাত্রীর নীরবতা, সম্মতিসূচক মাথা নাড়া, কিংবা কোনো অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে যদি ইঙ্গিত পাওয়া যায়, বিবাহে তার কোনো আপত্তি নেই; তাহলেই সেটি তার সম্মতি হিসেবে ধরে নেয়া হয়। অন্যথায়, বিয়ের ব্যাপারে তার আপত্তি থাকলে, তাকে অবশ্যই তা কথা বা কাজের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে হবে।

পাত্রীর মৌন সম্মতিটুকু হলো বিয়ের জন্য সর্বনিম্ন শর্ত। কারণ,, লোক-লজ্জার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই'-এই জাতীয় কথা বলে খোলাখুলিভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করা অধিকাংশ পাত্রীর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। ইবনু 'আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেন:

> “এক কুমারী নারী নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে বলল, তার পিতা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিয়ে দিয়েছে। নবিজি ﷺ তাকে (বিয়ে বহাল রাখার অথবা বিয়ে ভেঙে দেওয়ার) অনুমতি দিলেন।”[৪৬]

অকুমারী পাত্রী হলো সেই নারী যে স্বাভাবিক বিয়ের মাধ্যমে হোক আর যেনার মাধ্যমেই হোক, কোনো পুরুষের সাথে কমপক্ষে একবার যৌনমিলনে লিপ্ত হয়েছে।

সাধারণত একজন অকুমারী নারী জীবন সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞতা রাখে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন কুমারীর তুলনায় অধিক সক্ষম। সুতরাং তাকে তার মৌখিক মতামত প্রকাশের এবং নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার ওয়ালী অবশ্যই তার সিদ্ধান্তকে সম্মান দেখাবে যা উল্লিখিত হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে।

আল-খানসা’ ইবনু খিসাম আল-আনসারিয়্যাহ্ ﵂ বর্ণনা করেন, তার পিতা (তার অনুমতি না নিয়েই) তার বিয়ে দিয়েছিল। সে সময় তিনি অকুমারী ছিলেন। ওই বিয়ে তার পছন্দ হয়নি এবং তিনি নবিজি ﷺ-এর নিকট গিয়ে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে তিনি বিয়ের চুক্তিটি বাতিল করে দেন।[৪৭]

পারিবারিক আইনের পরিভাষায় ইয়াতীম মেয়ে হলো সেই কুমারী যার পিতা মারা গেছে। বিয়ের জন্য অনুমতির ক্ষেত্রে, এ ধরনের ইয়াতীম কুমারীকে অন্যান্য সাধারণ কুমারীদের থেকে মতামত প্রকাশের বেশি অধিকার দেওয়া হয়।

‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমার ﵄ বর্ণনা করেন যে:

> ‘উসমান ইবনু মা‘যুন ﵁ তার স্ত্রী খুওয়াইলাহ্ ইবনু হাকিম ﵂-এর পেটের একটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। ‘উসমান ﵁ ইষ্টিপত্রে তার ভাই কুদামাহ্ ইবনু মাযু‘উনকে তার কন্যার জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করে যান। ইবনু ‘উমার সেই ইয়াতীম মেয়েটিকে বিয়ে করার জন্য কুদামাহ্‌কে (কুদামাহ্ সম্পর্কে ইবনু ‘উমারের মামা) প্রস্তাব করেন এবং কুদামাহ্ তার সাথে বিয়ে দিতে রাজি হন। মুগিরা ইবনু শু‘বাহ্ ওই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য মেয়ের মায়ের কাছে প্রস্তাব নিয়ে যান এবং অর্থের বিনিময়ে তাকে রাজি করান। ফলে মেয়ের মা তার প্রস্তাবে মত দেয় এবং মেয়েও তার মায়ের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে ইবনু ‘উমারকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হন এবং বিষয়টি নিয়ে নবিজি ﷺ-এর সামনে হাজির হন। কুদামাহ্ ﵁ বললেন:

[৪৬] হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহ ইবনু মাজাহ্, হাদীস নং ১৫২০)।

[৪৭] আল-বুখারি এবং আহ্‌মাদসহ অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন।

> “হে আল্লাহর রাসূল, সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। তিনি (আমার ভাই) আমাকে তার (মেয়ের) অভিভাবক নিযুক্ত করে গেছেন এবং আমি ‘আব্দুল্লাহ্ ইবনু ‘উমারের দীনদারী এবং সমকক্ষতা বিবেচনা করেই তার সাথে ভাতিজির বিয়ের কথা দিয়েছিলাম। যাই হোক, সে তো শুধু একজন নারী, আর এখন সে তার মায়ের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিচ্ছে।”
>
> আল্লাহর রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন:
>
> “সে একজন অনাথ এবং তার অনুমতি ছাড়া তার বিয়ে দেওয়া যাবে না।”
>
> ইবনু ‘উমার বললেন:
>
> “আল্লাহর কসম! এভাবেই তাকে আমার থেকে নিয়ে নেওয়া হলো এমনকি যদিও (বিয়ের মাধ্যমে) আমি তার অভিভাবক হয়ে গিয়েছিলাম এবং আল-মুগিরাহ্ ইবনু শু‘বাহ্র সাথে বিয়ে দেওয়া হলো।” [৪৮]

যদি বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর উভয়েই ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী হয়, এবং প্রথমে নারী ক্রীতদাসীকে মুক্ত করা হয়, তা হলে স্বামীর সাথে থাকার বা স্বামীকে ত্যাগ করার সুযোগ রয়েছে তার। যদি সে প্রথমটি বেছে নেয়, তা হলে সে তার স্বামীর বিবাহিতা স্ত্রী হিসেবেই রয়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে তার জন্য আর অন্য কিছু করার সুযোগ থাকে না।

নারীর জন্য অভিভাবকের অপরিহার্যতা

কোনো নারী নিজেই নিজের বিয়ে করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে তার ওয়ালী তার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে। সে কুমারী হয়ে থাকলে ওয়ালী তার সম্মতির কথা জেনে নেবে। আবু মুসা আল-আশ‘আরি, ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘আব্বাস, জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ্ এবং আবু হুরায়রা ؓ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> “ওয়ালী ছাড়া বিয়ে বাতিল।” [৪৯]

অতএব বিয়ের চুক্তিনামা সম্পাদনের সময় এটি বৈধ হওয়ার জন্য নারীর একজন ওয়ালীর উপস্থিত থাকাটা একটি শর্ত।

নিয়মানুযায়ী, নারীর ওয়ালী হলো তার পিতা। যদি কোনো কারণে পিতা তার ওয়ালী হতে না পারে, তা হলে তার ওয়ালী হবে তার পরবর্তী নিকটতম মাহ্রামদের

---

[৪৮] হাদীসটি আহ্মাদ এবং আদ্-দারাকুতনিসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৮৩৫)।

[৪৯] হাদীসটি আবু দাউদ এবং আত-তিরমিযিসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৮৩৯)।

(যেমন: দাদা, নিজের ছেলে, ভাই, চাচা প্রমুখদের) মধ্য থেকে কেউ। নারীর নিকটতম আত্মীয়রা অমুসলিম হলে, শার'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা কেউ নারীর অভিভাবক হতে পারে না।

পাত্রীর রক্তসম্পর্কের কোনো মুসলিম আত্মীয় না থাকলে, ইসলামী শাসক বা কাজীর তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তার জন্য ওয়ালী নিযুক্ত করবে। অনেক অমুসলিম দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্থানীয় ইমাম ইসলামী কাজীর সাধারণ দায়িত্বসমূহ পালন করেন এবং নারীর কোনো ওয়ালী না থাকলে তিনিই সেই নারীর ওয়ালী হন।

অনেক অমুসলিম দেশে একটি প্রচলিত রীতি হলো, নারীর কোনো মুসলিম মাহ্‌রাম ওয়ালী না থাকলে নারী নিজেই নিজের জন্য ওয়ালী নিযুক্ত করে। এটি অন্যায় এবং এমনটি করার কোনো অধিকার তার নেই। যেমনটি উপরে দেখেছি, এই কাজটি করার অধিকার রয়েছে মুসলিম কাজী বা ইমামের। এই ভ্রান্ত রীতি অনেক অশুভ পরিণতির জন্ম দিয়েছে যার কয়েকটি নিম্নরূপ:

- নিযুক্ত ওয়ালীর প্রতি যে অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করা হয়, অনেক ক্ষেত্রেই ওয়ালীকে সেই বিশ্বাসের অমর্যাদা করতে দেখা যায় এবং নিয়োগকারীর স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়।
- কোনো কোনো নারী তার ওয়ালীর সাথে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। তারা তার সাথে অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আত্মীয়ের মতো আচরণ করে। অনেক সময় তার সাথে পুরোপুরি নির্জনে সাক্ষাৎ (খুল্‌ওয়াহ্‌) করে এবং নিজের ব্যক্তিগত গোপনীয় বিষয়ে কথা বলে। এ ধরনের আচরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড় রকমের পাপের পথ খুলে দেয়।
- কোনো কোনো নারী তার ওয়ালীর পক্ষ থেকে এমন কিছু প্রত্যাশা করে যা তার কর্তব্যসীমার বাইরে। তার একমাত্র কর্তব্য হলো নারীর প্রতিনিধিত্ব করা এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিয়ের চুক্তি সম্পাদনের সময় নারীর স্বার্থ রক্ষার জন্য কাজ করা। এই কাজটুকু হয়ে গেলেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় এবং সে আর নারীর ওয়ালী থাকে না। তবে কোনো কোনো নারী মনে করে, ওয়ালীর সম্মান ও পদ হলো স্থায়ী এবং জীবনের ছোট-বড় সকল ব্যাপারে তাকে ডাকতে হবে। এই ব্যাপারগুলোই একসময় অন্তরঙ্গ সম্পর্কের জন্ম দেয় এবং বড় ধরনের গর্হিত পাপাচারের পথকে উন্মুক্ত করে।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের শেখা হলো, বিয়ের চুক্তিনামা বৈধ হওয়ার জন্য ওয়ালীর (বা ওয়ালীর প্রতিনিধি) উপস্থিত থাকা একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। অতএব ওয়ালীর সম্মতি এবং অনুমোদন ছাড়া কোনো বিয়ে সংঘটিত হলে সেই বিয়ে বাতিল বলে গণ্য। 'আইশাহ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "ওয়ালীর অনুমতি ছাড়া যে নারীই বিয়ে করুক, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল, তার বিয়ে বাতিল। তবে (ওয়ালিহীন বিয়ের পর) যদি সে (স্বামী) তার সাথে যৌন মিলনে লিপ্ত হয়, তা হলে মোহর পাওয়া নারীর অধিকার; কারণ, সে তার লজ্জাস্থানে গমন করেছিল। যদি তারা বিবাদে লিপ্ত হয়—তা হলে যার ওয়ালী নেই, তার ওয়ালী হবে দেশের শাসক।" [৫০]

ওয়ালীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

ওয়ালী স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী হোন অথবা তাকে নিযুক্ত করা হোক, অধীনস্থের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর অনেক বিশাল দায়িত্ব রয়েছে। তিনিই তার অধীনস্থের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং সর্বোত্তম পন্থায় অধীনস্থের কল্যাণের দিকে নজর রাখবেন। তিনি খোঁজখবর নিয়ে নিশ্চিত হবেন, বিয়ের প্রস্তাবকারী পুরুষ নারীর যোগ্য এবং উপযুক্ত কি না। এ ক্ষেত্রে তার যোগ্যতার মাপকাঠি হবে তা-ই যা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক পদমর্যাদা, ধনসম্পদ কিংবা অন্য কোনো পার্থিব অর্জন তার কাছে পাত্র যাচাইয়ের মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়।

'আইশাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত উল্লিখিত হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই, ওয়ালী যদি নিয়োগকারী নারীর জন্য কোনো উটকো ঝামেলার সৃষ্টি করে বা নারীকে এমন কোনো কিছু করা থেকে বাধা প্রদান করে যা করার অনুমতি আল্লাহ নারীকে দিয়েছেন, তা হলে সে নারী এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে পারে এবং ইসলামী কর্তৃপক্ষের সামনে নিজের পক্ষে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে নারীর অভিযোগসমূহ সত্য বলে প্রমাণিত হলে, ইসলামী কাজী ওয়ালীকে তার কর্মপন্থা বদলানোর আদেশ করতে পারেন, কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির ওপর তার অভিভাবকত্ব অর্পণ করতে পারেন, অথবা নারীর পরিস্থিতি বুঝে অন্য কোনো উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

যদি দেখা যায়, অভিভাবক তার দায়িত্ব পালনে অযোগ্য, তা হলে পূর্বোল্লিখিত নিয়মে তিনি তার অভিভাবকত্ব (ওয়ালীর পদ) হারাবেন।

---

[৫০] হাদীসটি আহমাদ এবং আবু দাউদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৮৪০)।

সাক্ষীর গুরুত্ব

বিয়ের চুক্তিনামা সম্পাদনের সময় দুজন বিশ্বস্ত মুসলিম পুরুষ সাক্ষীর উপস্থিত থাকা বিয়ের বৈধতার জন্য আরেকটি শর্ত। 'আইশাহ, ইমরান ইবনু হাসাইন এবং আবু মুসা আল আশ'আরি ﷺ বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

> "একজন ওয়ালী এবং দুজন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী ছাড়া কোনো বিয়ে বৈধ নয়।"[৫১]

পাত্রী তার ওয়ালীকে অনুমতি দিয়েছে কি না সাক্ষীগণকে তা শুনতে হবে এবং চুক্তিনামায় উল্লিখিত সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে নিতে হবে।

মোহর

ইসলামে দেনমোহর হলো একটি বাধ্যতামূলক আর্থিক সুবিধা যা বিয়ের সময় স্বামী তার স্ত্রীকে দিতে বাধ্য। আরবিতে একে 'মাহ্‌র' বা 'সাদাক্ব' বলা হয়। আল্লাহর আদেশ হলো:

« (বিয়ের সময়) নারীদেরকে উপহার হিসেবে তার মোহর দিয়ে দাও।[৫২] »

স্ত্রীকে দেনমোহর প্রদান করা স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক হলেও, বিয়ের বৈধতার জন্য একে শর্ত বানানোর পক্ষে কোনো দলিল বা প্রমাণ নেই। মোহরের নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ না করেই বিয়ের চুক্তিনামা সম্পন্ন করা যেতে পারে। তবে স্বাভাবিকভাবে এমনটি না করাই উচিত। কারণ, এটি ভবিষ্যতে জটিলতা এবং বিরোধের জন্ম দিতে পারে।

মোহর হলো একমাত্র স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার, যা অন্য কেউ তার অনুমতি ছাড়া নিতে পারে না; এমনকি তার মাতা-পিতাও না। মোহর হলো এমন প্রতিদান যা স্ত্রী নিজের সর্বস্ব তার স্বামীর কাছে উন্মুক্ত করার বিনিময় হিসেবে গ্রহণ করে। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মোহরের সম্পূর্ণ অধিকারটুকু নারীকে প্রদান করেছেন; এমনকি তালাক্বের সময়েও নারী এই মোহরের মালিক থাকবে যদি না স্বামী তাকে তার কোনো অপরাধ বা সীমালঙ্ঘনের কারণে তালাক্ব দেয়।

---

[৫১] হাদীসটি আহমাদ এবং হিব্বানসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৮৩৯, ১৮৫৮, ১৮৬০)।

[৫২] আন-নিসা; ৪:৪

অতএব স্ত্রী চাইলে মোহরের পুরোটাই নিজের জন্য রেখে দিতে পারে, এর কিছু অংশ তার পিতা-মাতাকে দিয়ে দিতে পারে, অথবা চাইলে এর কিছু অংশ তার স্বামীকে ফিরিয়েও দিতে পারে—সবই তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।[৫৩]

মোহর হতে পারে নগদ অর্থ, স্বর্ণালংকার, আসবাব-সামগ্রী, জায়গা-জমি অথবা অন্য যেকোনো কিছু। অবস্তুবাচক কোনো উপহারও মোহর হতে পারে।

মোহরের পরিমাণ হতে হবে স্বামীর আর্থিক সামর্থ্য এবং স্ত্রীর সামাজিক অবস্থার সাথে যুক্তিযুক্ত ও সংগতিপূর্ণ। সাধারণত পাত্র এবং পাত্রীর (বা তার ওয়ালীর) মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমেই মোহর নির্ধারিত হয়ে থাকে।

সাধারণত মোহর হিসেবে নির্ধারিত নগদ অর্থ ছাড়াও কিছু সমাজে পাত্রের পক্ষ থেকে পাত্রীর জন্য অন্যান্য আর্থিক প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হয়। যেমন: পাত্রীর (স্ত্রী হিসেবে আইনগত অধিকারসীমার চেয়ে বেশি দেওয়া) পোশাক-আশাক, স্বর্ণালংকার, ইত্যাদি। ইসলামী বিধান মতে, এগুলোর সবকিছুই মোহরের অংশ বলে গণ্য হতে পারে এবং ভবিষ্যৎ ঝামেলা এড়ানোর জন্য উত্তম হলো এগুলোর সবকিছু স্পষ্ট করে বিয়ের চুক্তিনামায় লিখে রাখা।

মোহর নির্ধারণে পরিমিতিবোধ

ইসলাম মোহরের কোনো সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে না। তবে এটি স্বামীর জন্য হালকা এবং সহজ করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। মোহরের বোঝা ভারী হলে মানুষ বিবাহে নিরুৎসাহিত হতে পারে; অনেক ক্ষেত্রে তা দুর্বিষহ ও বৈরী দাম্পত্যের এক অশুভ পূর্বাভাস হতে পারে।

অনেক মুসলিম দেশে, পাত্রীর বাবা-মা অত্যধিক বিশাল অঙ্কের মোহরের জন্য আবেদন করে থাকে। এতে অনেক যুবক বিয়ে এড়িয়ে যায়, অথবা অনেক বছর ধরে বিয়ে করে না। যার ফলে যুবক-যুবতীদের মাঝে ব্যভিচারসহ অন্যান্য পাপ ছড়িয়ে পড়ে। অতএব এ বিষয়ে সুবিবেচক হওয়ার পাশাপাশি বাবা-মার উপলব্ধি করা উচিত, পাত্রের কাছে অনেক কিছু দাবি করা তাদের মেয়ের জন্য এবং সর্বোপরি পুরো মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষতি বয়ে আনতে পারে।

---

[৫৩] লক্ষণীয়, কোনো নারী তার ধন-সম্পত্তি থেকে কীভাবে খরচ করবে সেটাও স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষ। এ বিষয়ে লেখকের ধারাবাহিক পর্বের তৃতীয় অধ্যায় 'দি ফ্র্যাজাইল ভেসেল্‌সএ আরও আলোচনা করা হয়েছে।

'উক্‌বাহ্ ইবনু 'আমির ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "সর্বোত্তম বিয়ে (বা মোহর) হলো সেগুলো যেগুলো সবচেয়ে সহজ।"[৫৪]

স্বামীর জন্য মোহর হালকা হলে তা স্ত্রীর জন্য বারাকাহ ও কল্যাণের লক্ষণ। 'আইশাহ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নিশ্চয়ই একজন নারীর জন্য কল্যাণের লক্ষণ হলো তার বাগ্‌দান, সাদাক, এবং গর্ভ (সন্তান প্রসব) সবকিছুই সহজ হয়ে যায়।"[৫৫]

অনির্ধারিত মোহর

বিয়ের চুক্তিনামা সম্পাদনের সময় মোহর নির্ধারিত না হলেও, স্ত্রী তার মোহর পাওয়ার অধিকার হারায় না।

'উক্‌বাহ্ ইবনু 'আমির ﷺ বর্ণনা করেন,

> নবিজি ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, "অমুক মহিলার সাথে আমি তোমার বিয়ে করালে তুমি কি রাজি আছ?" সে উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ।' তারপর নবিজি ﷺ সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন, "অমুক ব্যক্তির সাথে আমি তোমার বিয়ে করালে তুমি কি রাজি আছ?" সে উত্তর দিলো, 'হ্যাঁ।' সুতরাং, মোহরের কথা উল্লেখ না করে বা পাত্রীকে কোনোকিছু না দিয়ে, তিনি দুজনের বিয়ে দিয়ে দিলেন। লোকটি ছিল হুদায়বিয়াহ্‌র সন্ধির সাক্ষীদের একজন এবং খাইবার যুদ্ধের গনিমতের মালের একটা অংশ সে পেয়েছিল।

তার মৃত্যু নিকটবর্তী হলে, লোকটি বলেছিল:

> "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল ﷺ অমুকের সাথে আমার বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু, আমি তাকে কিছুই দেইনি। তোমরা আমার সাক্ষী থেকো, এখন আমি তাকে মোহর হিসেবে খাইবার থেকে পাওয়া অংশটুকু দিচ্ছি।"

এরপর, মহিলা সে অংশটি গ্রহণ করল এবং তা এক শ হাজারের বিনিময়ে বিক্রয় করল।[৫৬]

---

[৫৪] হাদীসটি আবু দাউদ এবং ইবনু মাজাহ্‌সহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৩২৭৯, ৩৩০০; আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৮৪২ এবং ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৯২৪)।

[৫৫] হাদীসটি আহ্‌মাদ এবং আল-হাকিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ২২৩৫, এবং ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৯২৮)।

[৫৬] হাদীসটি আবু দাউদ এবং ইবনু হিব্বানসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে

আলকামাহ্ ﷺ বর্ণনা করেন,

> 'আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদ ﷺ-এর নিকট কিছু লোক এসে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইল যেখানে তাদের একজন মোহর নির্ধারণ না করেই এক মহিলাকে বিয়ে করেছিল এবং মহিলার সাথে সহবাস করার আগেই লোকটি মারা গিয়েছিল। 'আবদুল্লাহ্ বললেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে চলে আসার পর, আমাকে এর চেয়ে বেশি কঠিন কোনো প্রশ্ন করা হয়নি। অন্য কারও কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।" তার কাছ থেকে একটা উত্তর পাওয়ার জন্য তারা এক মাস চেষ্টা চালানো পর অবশেষে বলল, "আপনাকে জিজ্ঞেস না করে আমরা অন্য আর কাকে জিজ্ঞেস করব, যেখানে আপনি হলেন এই দেশে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সবচেয়ে প্রখ্যাত সাহাবী এবং অন্য কাউকে খুঁজে পাই না?" তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে তার (মহিলার) ব্যাপারে আমার সর্বোত্তম মতামত দেওয়ার চেষ্টা করব। যদি তা সঠিক হয়, তা হলে তা শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে, যার কোনো শরীক নেই। আর যদি তা ভুল হয়, তা হলে তা আমার ও শয়তানের পক্ষ থেকে আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবেন।" অতঃপর তিনি বললেন:
>
> "(তার নিজ পরিবারের অন্যান্য) নারীদের মতোই, কোনো কম বা বৃদ্ধি না করে, তাকে মোহর দিতে হবে এবং সে (চার মাস দশ দিন) ইদ্দত পালন করবে এবং তাকে তার উত্তরাধিকারের অংশ দিতে হবে।"
>
> ওই সময় সেখানে আশ্‌জা'ঈ গোত্রের কিছু লোক উপস্থিত ছিল এবং তাদের মধ্য থেকে মা'কিল ইবনু সিনান আল-আশ্‌জা'ঈ নামের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলল:
>
> "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহর রাসূল ﷺ বারওয়া বিনতু ওয়াশিক নামে আমাদেরই এক মহিলার ব্যাপারে যে রায় দিয়েছিলেন, আপনার রায় তার অনুরূপ।"
>
> এ কথা শোনার পর আবদুল্লাহ্ ইবনু মাস'ঊদকে এত খুশি দেখাচ্ছিল, তার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তাকে এতটা খুশি আর কখনো দেখা যায়নি।[৫৭]

উপরের বর্ণনাসমূহ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে—যদি বিয়ের সময় কোনো মহিলার মোহর নির্ধারণ না করা হয়, অথবা যদি স্বামীর আর্থিক অবস্থা এবং সমমর্যাদার অন্যান্য মহিলাদেরকে সাধারণত যে পরিমাণ মোহর দেওয়া হয় সে তুলনায় তার মোহর অনেক কম হয়, সেক্ষেত্রে সে তার ন্যায্য পরিমাণ মোহর

সহীহ বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৯২৪)।

[৫৭] হাদীসটি আবু দাউদ এবং আন নাসা'ঈ সহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৯৩৯)।

পাওয়ার অধিকার হারায় না। এ ব্যাপারে মহিলা ইসলামী কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারে।

অতএব বিয়ের সময় পাত্রীকে ন্যায্য পরিমাণ মোহর দেওয়া হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য তার ওয়ালীকে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে। এরপর যদি স্ত্রী মোহরের কিছু অংশ বা এর পুরোটাই তার স্বামীকে দিয়ে দিতে চায়, তা হলে তাকে তা করতে হবে স্বেচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে।

এখানে একটি দুর্বল বর্ণনার ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়াটা খুবই জরুরি। এই ঘটনাটি 'উমার এবং এক মহিলার মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। এমনকি লক্ষণীয়, বর্ণনার দুর্বলতার কথা উপলব্ধি না করেই অনেকে এই ঘটনাকে উদ্ধৃত করেন।

একবার 'উমার একটি বক্তৃতা দেন যাতে তিনি মাত্রাতিরিক্ত মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, "নবিজি ﷺ-এর পত্নী এবং কন্যাগণের মোহরের চেয়ে অধিক মোহর নির্ধারণে আমি অনুমতি দেবো না।" এতে এক মহিলা প্রতিবাদ করে বলল:

হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি এইমাত্র লোকদেরকে অতিরিক্ত মোহরের ব্যাপারে নিষেধ করে দিলেন। আপনি কেন আমাদেরকে তা পেতে বাধা দেবেন যা সুমহান আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন?"

তারপর সে পাঠ করল:

﴿ وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴾

« তোমরা এক স্ত্রীর জায়গায় অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাইলে এবং তাকে যদি বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ (মোহরানা হিসেবে) দাও, তা হলে তা থেকে কিছুই ফেরত নেবে না। তোমরা কি অপবাদ দিয়ে আর স্পষ্ট পাপ করে তা ফেরত নিতে চাচ্ছ?[৫৮] »

এ কথা শুনে 'উমার (দুই অথবা তিন বার) বলল, "সকলেই 'উমারের চেয়ে অধিক বোঝার ক্ষমতা রাখে। নিশ্চয়ই একজন মহিলা সঠিক আর 'উমার ভুল!" অতঃপর তিনি মিম্বরে ফিরে গেলেন এবং লোকদের উদ্দেশে বললেন:

---

[৫৮] আন-নিসা; ৪:২০।

"নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে নারীদের অধিক মোহর নির্ধারণের ব্যাপারে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন আমি বলছি, প্রত্যেক পুরুষ যেভাবে খুশি তার সম্পদ খরচ করুক।"[৫৯]

বর্ণনাটিতে দুর্বলতার কথা উল্লেখ করার পর, আল-আলবানি ﷺ বলেছেন:

"তা ছাড়া, এখানে মহিলার এই আয়াতের উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক। আয়াতটিতে আসলে বিনা কারণে যে নারীকে তালাক দেওয়া হয় তার ব্যাপারে বলা হয়েছে। এখানে বোঝানো হয়েছে, স্পষ্ট কোনো পাপ না থাকার পরও তোমরা অনেকে আগের স্ত্রীকে অপছন্দ করছ। তার সাথে সদয় আচরণের আর কোনো ধৈর্য নেই তোমাদের। তোমরা এখন তার বদলে নতুন স্ত্রী গ্রহণ করতে চাচ্ছো। এখন তাকে যদি আগেই বড় কোনো অঙ্কের অর্থ মোহরানা দিয়ে থাকো, সেটা সে পুরো পাক বা না পাক, কিংবা যদি শপথও করে থাকো, তবুও তা থেকে বিন্দুপরিমাণ ফেরত নিয়ো না। পুরোটাই ন্যায্য মালিককে দিয়ে দাও। তোমরা কেবল কামনা ও উপভোগের জন্য তার জায়গায় অন্য একজনকে বিয়ে করতে চাচ্ছো। যদি শার'ঈ কারণে হতো তা হলে কিছু অংশ ফেরত নেওয়ার অনুমতি পেতে, যেমন: তার নিজের পক্ষ থেকে তালাক চাওয়া বা তোমাদেরকে আঘাত করে তালাক দিতে বাধ্য করা।

যদি সে এ ধরনের কোনো কিছু না করে থাকে, তা হলে তোমরা কি করে তার অর্থ থেকে কিছু নিতে পারো?"[৬০]

সাধারণত বক্তা এবং লেখকেরা এই ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন এবং এর মাধ্যমে বেশকিছু বিষয় প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যেগুলোর কয়েকটি পুরোপুরি ভুল। এই ভুল অনুসিদ্ধান্তগুলোর কয়েকটি নিম্নরূপ:

- অতিরিক্ত মোহর দাবি করার অনুমতি আছে;
- মহিলাদের মাসজিদের মধ্যে উঠে দাঁড়ানো এবং ইমাম বা কোনো বক্তাকে শুধরে দেওয়ায় কোনো সমস্যা নেই;
- মহিলারা নারী-পুরুষের সমন্বিত সমাবেশে ভাষণ দিতে পারে;
- ইসলামের কোনো বিদ্বানই খুব বেশি সম্মানের পাত্র নন। কারণ, একজন সাধারণ মহিলাও খুব সহজেই তার ভুলভ্রান্তি প্রকাশ করে দিতে পারে;

[৫৯] আবু ইয়া'লা, আল বায়হাক্বী এবং আব্দুর রায্যাক সম্মিলিতভাবে বর্ণনাটি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি বর্ণনাটিকে অত্যন্ত দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৯২৭ এবং রাফউল মালাম, পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪)।

[৬০] রাফউল মালাম 'আনিল আ'ইম্মাতিল আ'লাম (পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫) এর ব্যাখ্যা।

- মহিলারা বিভিন্ন ধর্মীয় পরিষদ, যেমন: ইসলামী সংঘ ও সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, এমনকি প্রধান হিসেবেও কাজ করতে পারবে।

বাকি মোহর

বিয়ের চুক্তিনামা সম্পাদনের ঠিক পরপরই পাত্রীকে তার মোহর দিয়ে দেওয়ার জন্য জোরালোভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

অথচ আমাদের সমাজে প্রচলিত একটা ভ্রান্ত রীতি হলো—মোহরকে দু'ভাগে ভাগ করে প্রথম অংশ বিয়ের চুক্তি সম্পাদনের সময় (উসুল লিখে) প্রদান করা এবং অন্য অংশটি স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু বা তালাকের সময় প্রদান করার জন্য বাকি রাখা।

মোহর বাকি রাখার এই নব প্রচলিত কুপ্রথাটি সুন্নাহ্‌র আদর্শ অনুসরণের বিচ্যুতি। এতে মোহরের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়, যা স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তাকে প্রদান করতে হবে। বাকি মোহরের বিশাল অঙ্কের ঋণ স্বামীর জন্যও বোঝা যা পরিশোধ করার জন্য সে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত দায়বদ্ধ থাকে।

অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলিমদের জন্য এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি। বাড়ি কিংবা অন্যান্য বিষয়সামগ্রী স্বামী বা স্ত্রী যে-ই কিনুক না কেন, যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতে ওই কেনা জিনিসের ওপর স্বামী এবং স্ত্রীর উভয়েরই সমান মালিকানা আরোপিত হয়। এটি ন্যায়সংগত নয় এবং কেউ কোনো কিছুর মালিক না হলে তার জন্য সেটা নিজের বলে গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

কাজেই, স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীকে যদি অর্ধেক সম্পত্তি দিয়ে দেওয়া হয় অথবা স্বামী যদি তাকে তালাক দেয়, তা হলে স্ত্রীর ভাবা উচিত হবে না, সেই সম্পত্তির প্রতি তার অধিকার আছে; বরং ইসলামী বিধান মোতাবেক সে তার ন্যায্য অংশটুকু চাইবে এবং তার বাইরে সবকিছুর অধিকার সে ছেড়ে দেবে। তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বিচারের দিনে তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে; তিনি সেদিন সীমালঙ্ঘনকারী এবং যাদের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করবেন।

নারীর কাছ থেকে তার মোহর নিয়ে নেয়ার কঠিন শাস্তি

পুরুষের কাঁধে নারীর মোহর অনেক বড় ঋণের বোঝা। সেই কারণে নারীর সম্মতি ছাড়া তার থেকে মোহর নিয়ে নেয়া গুনাহ কাবীরাহ বা গুরুতর অপরাধ। ইবনু 'উমার বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপগুলোর একটি হলো ওই ব্যক্তির (পাপ) যেকোনো নারীকে বিয়ে করে, এবং তার সাথে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নেওয়ার পর সে তাকে তালাক দিয়ে দেয় এবং তার মোহর ফিরিয়ে নেয়; এবং সেই ব্যক্তির পাপ যে কাজের জন্য কাউকে নিয়োগ দিয়ে কাজ করিয়ে তাকে তার প্রাপ্য পারিশ্রমিক দেয় না; এবং সেই ব্যক্তির পাপ যে অকারণে পশু হত্যা করে।"[৬১]

পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দেশে বিরাজমান একটি পরিস্থিতির কথাও এই হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য দেশ থেকে আগত কিছু মুসলিম পুরুষ হালকা মোহরের বিনিময়ে পাশ্চাত্যের মুসলিম নারীদেরকে বিয়ে করে, যার নাম তারা দিয়েছে Contract marriage। এর সুবাদে তারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাদেরকে উপভোগ করে এবং প্রায়ই স্ত্রীদের বদৌলতে ঐসব দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে। স্ত্রীদের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি হয়ে গেলেই তারা দ্বিধাহীন-চিত্তে তাদেরকে তালাক দিয়ে দেয়! এভাবেই তারা স্ত্রীদের কাছ থেকে সুবিধা ভোগ করে। তার চেয়েও বড় কথা হলো, তারা তাদেরকে ন্যায্য মোহর থেকেও বঞ্চিত করে। তাদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং মনে রাখা, এসব কাজ করে তারা দুনিয়ার জীবনে পার পেয়ে গেলেও বিচারের দিনে সুমহান আল্লাহর কাছ থেকে তারা ছাড়া পাবে না।

বাড়তি শর্ত আরোপের বিধান

বিয়ের চুক্তিনামা সম্পাদনের সময়, চাইলে উভয় পক্ষই কিছু শর্ত দিতে পারে যেগুলো ভঙ্গ করলে চুক্তিনামা বাতিল বলে গণ্য হবে। ইসলামী মূলনীতির কোনোরূপ লঙ্ঘন না হলে, এই ধরনের শর্তারোপ করা বৈধ এবং গ্রহণযোগ্য। এই ধরনের শর্তারোপ সাধারণত স্ত্রীর পক্ষ থেকে করা হয়। কারণ, স্বামী তালাক প্রদানের মাধ্যমে বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে এবং এ কাজকে সহজ করার জন্য স্বামীর নিজের কোনো শর্তের প্রয়োজন নেই। 'উক্ববাহ্ ইবনু 'আমির আল-জুহানি ﷺ বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

> "যেসব শর্তের মাধ্যমে তোমরা নারীদের লজ্জাস্থানসমূহে গমনের অধিকার লাভ করো সেগুলো সবচেয়ে বেশি পরিপূর্ণ হওয়ার যোগ্য।"[৬২]

---

[৬১] হাদীসটি আল-হাকিম এবং আল-বায়হাকি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ১৫৬৭, এবং আস্-সহীহাহ, হাদীস নং ৯৯৯)।

[৬২] আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন।

শর্তসমূহ যদি ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়, তা হলে সেগুলো অবশ্যই পূরণ করতে হবে এবং সেগুলো ভঙ্গ করা হলে স্ত্রী বিয়ে-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে। কারণ, এই ধরনের শর্ত পূর্ণ না করা স্ত্রীর পক্ষ থেকে বিয়ে বিচ্ছেদের জন্য কারণ, হিসেবে যথেষ্ট।

অপর পক্ষে, স্ত্রী ক্ষমা এবং ঔদার্যবশত তার কোনো দাবি ত্যাগ করতে পারে। এ ছাড়া কাজী ইসলামী মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক এমন যেকোনো শর্তও স্থগিত করতে পারে।

শর্তসমূহের কোনোটি যদি ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী হয়, তা হলে তা নিজে থেকেই বাতিল বলে গণ্য হবে। 'আইশাহ এবং ইবনু 'আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে শর্ত আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নয় তা বাতিল, এমনকি তা এক শটি শর্ত হলেও।"[৬৩]

চুক্তিনামা সম্পাদন প্রক্রিয়া

খুৎবাহ্

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পরিচালনাকারী ব্যক্তিকে 'খুৎবাতুল হাজাহ্'-এর মাধ্যমে তার কার্য শুরু করার জন্য জোরালোভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং ইবনু মাস'ঊদ এবং জাবির ﷺ এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৬৪]

ইজাব ও কবুল

ইজাব এবং কবুল (কন্যা সমর্পণ এবং স্ত্রী গ্রহণ) হলো চুক্তিনামার দুটি প্রধান এবং প্রকৃত স্তম্ভ। এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে তাদের পারস্পরিক সম্মতি ও একে অপরকে গ্রহণ করার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্যই সুস্পষ্ট বাক্য ও উচ্চারণের মাধ্যমে দুজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে একই বৈঠকে ইজাব এবং কবুল পাঠ করতে হবে।

অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাত্র এবং পাত্রী উভয়কে নিম্নোক্ত কথাগুলো (অথবা একই মর্মে অনুরূপ কিছু) বলতে সাহায্য করতে পারেন:

---

[৬৩] আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন।

[৬৪] সম্পূর্ণ খুৎবাহ্টি এই বইয়ের শুরুতে ভূমিকায় উদ্ধৃত করা হয়েছে।

ক. ওয়ালীর ক্ষেত্রে

"আমি আমার দায়িত্বাধীন (অমুক) নারীকে আল্লাহর বিধান এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী আমরা যে মোহর এবং শর্তসমূহে সম্মত হয়েছি, তার বিনিময়ে আপনার কাছে সমর্পণ করছি।"

খ. পাত্রের ক্ষেত্রে

"আমি আপনার দায়িত্বাধীন (অমুক) নারীকে আল্লাহর বিধান এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী আমরা যে মোহর এবং শর্তসমূহে সম্মত হয়েছি, তার বিনিময়ে বিয়ে করছি।"

অবশ্যই ইজাব এবং কবুলের বক্তব্যের তথ্য একই রকম হতে হবে। দুই বিবৃতির মধ্যে যেকোনো তথ্যগত অসামঞ্জস্য থাকলে চুক্তিনামা বাতিল হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ: যদি ওয়ালী বলেন, "এক হাজার মোহরের বিনিময়ে অমুককে আমি তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি," আর পাত্র যদি উত্তরে বলেন, "আমি আট শ মোহরের বিনিময়ে অমুককে গ্রহণ করলাম,"—তা হলে চুক্তিনামা তাৎক্ষণিকভাবেই বাতিল হয়ে যাবে।

চুক্তিনামা লিখে রাখা

বৈধতার জন্য বিয়ের চুক্তিনামা লিখে রাখা বা দলিল তৈরি করা কোনো শর্ত নয়। তবে স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রমাণ হিসেবে এটি লিখে রাখা জরুরি।

বিয়ের চুক্তিনামা সম্পন্ন হয়ে গেলেই, স্ত্রীকে স্বামীর আগাম মোহর প্রদান করার দায়িত্বসহ, স্বামী এবং স্ত্রীর পারস্পরিক সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাৎক্ষণিকভাবেই কার্যকর হয়ে যায়।

বিয়ের অনুষ্ঠান

বিয়ের সংবাদ লোকজনের মাঝে প্রচার করা

বিয়ের চুক্তিনামার মাধ্যমে একজন নারী এবং একজন পুরুষের মাঝে একটি নতুন সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। যেখানে কয়েকদিন আগেও তারা ছিল পরস্পরের অপরিচিত, সেখানে তাদেরকে এখন থেকে প্রকাশ্যে একসাথে চলতে-ফিরতে দেখা যেতে পারে। কাজেই বিয়ের খবর যদি লোকজনকে না জানানো হয়, তা হলে অনেকে তাদের সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করতে পারে। সে কারণেই কোনো রকম অতিরঞ্জন এবং অপব্যয় না করে, যতদূর সম্ভব বিয়ের খবর লোকজনকে জানিয়ে দেওয়া জরুরি। আবদুল্লাহ্ ইবনু আয্-যুবায়ের ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "বিয়েকে প্রচার করে দাও।"[৬৫]

এবং আস সা'ইব ইবনু ইয়াযিদ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "বিয়ে সম্পর্কে লোকজনকে জানিয়ে দাও এবং তা প্রচার করো।"[৬৬]

সাধারণত বিয়ের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ের খবর লোকজনকে জানানো হয়। এর মধ্যে থাকে নানা ধরনের উদ্‌যাপন কর্মকাণ্ড, যেমন: গান গাওয়া, বাদ্য বাজানো, মহিলাদের আনন্দ করা সহ 'ওয়ালীমাহ্' নামক ভোজের আয়োজন। এই অধ্যায়ে আমরা বিয়ের অনুষ্ঠানে যেসব উদ্‌যাপন কর্মকাণ্ড ইসলামে অনুমোদিত সেগুলো নিয়ে

---

[৬৫] হাদীসটি আহ্‌মাদ এবং ইবনু হিব্বানসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আদাবুয্ যিফাফ, পৃষ্ঠা ১৮৩)।

[৬৬] হাদীসটি (আল-কাবির গ্রন্থে) আত-তাবারানি সহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ১০১০, ১০১১; আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৪৬৩)।

আলোচনা করব। পাশাপাশি ঐসব কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেও সতর্ক করব যেগুলো ইসলামে অনুমোদিত নয়। তবে ওয়ালীমা বিষয়ক আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে করব।

দু'আ করা

বিবাহিত দম্পতির কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করে দু'আ করাকে জোরালোভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ নববিবাহিত দম্পতির উদ্দেশে বলতেন:

> "আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন, তোমাদের উভয়ের প্রতি বরকত প্রেরণ করুন এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে যা কিছু হয় তার মধ্যে কল্যাণ দান করুন।"[৬৭]

'আকিল ইবনু আবি তালিব ﵁ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে (নববিবাহিতদের জন্য) এই দু'আ করার শিক্ষা দিতেন:

> "আল্লাহ তোমাদের (বিয়েকে) বরকতময় করুন এবং তোমাদেরকে বরকত দান করুন।"[৬৮]

গান-বাজনা নিষিদ্ধ হওয়া

সাধারণ নিয়মানুযায়ী, ইসলামে গান-বাজনা হারাম। এ কথা সহীহ্ হাদীস এবং চার ইমামসহ ইসলামের স্বর্ণযুগের সকল 'আলিমদের সর্বসম্মত ঐকমত্যের দ্বারা সমর্থিত। আবু মালিক আল-আশ'আরি ﵁ বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

> "আমার উম্মতের মধ্য হতে একদল লোক এমন হবে যারা হির[৬৯], রেশমি বস্ত্র[৭০],মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে। তাদের মধ্য থেকে কিছু লোক একটি পাহাড়ের পাদদেশে তাবু টাঙাবে। সন্ধ্যাবেলায় এক দরিদ্র মেষ-পালক রাখাল তার মেষগুলো নিয়ে তাদের কাছে আসবে এবং তাদের কাছে (আর্থিক সাহায্য) চাইবে। তারা (সাহায্য না করার অজুহাতে) বলবে, 'ফিরে যাও, আগামীকাল এসো।' এরপর, রাতের বেলায়

---

[৬৭] হাদীসটি আবু দাউদ এবং আত-তিরমিযিসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আদাবুয্ যিফাফ, পৃষ্ঠা ১৭৫)।

[৬৮] হাদীসটি আন নাসা'ঈ এবং ইবনু মাজাহ্সহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আদাবুয্ যিফাফ, পৃষ্ঠা ১৭৫-১৭৭)।

[৬৯] বিবাহিত ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারও সঙ্গে ব্যভিচার এবং অবিবাহিত পুরুষ ও অবিবাহিতা নারীর মধ্যে ব্যভিচার।

[৭০] যেকোনো রেশমবস্ত্র পরিধান করা পুরুষের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

> আল্লাহ তাদের ওপর পাহাড় ধসিয়ে তাদের অধিকাংশকেই ধ্বংস করে দেবেন এবং বাকিদেরকে তিনি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত বানর ও শূকরে পরিণত করে রেখে দেবেন।"[৭১]

এবং আনাস ও 'ইমরানসহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

> "এই উম্মাতের কিছু লোককে ভূমিধস, পাথর বৃষ্টি এবং আকৃতি পরিবর্তন করে দেওয়ার মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হবে। এটি ঘটবে যখন তারা মদপান করবে, গায়িকা রাখবে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজাবে।"[৭২]

'দফ্' বাজনার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম

বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থেকে একটি যন্ত্র ব্যতিক্রম—তা হলো 'দফ'। এটি দেখতে অনেকটা খঞ্জনির মতো। তবে এতে কোনো ঘণ্টা বা ধাতব আংটা থাকে না। এই ব্যতিক্রম শুধু তিনটি উপলক্ষে প্রযোজ্য:

- 'ঈদ উদ্‌যাপনে।
- বিয়ে অনুষ্ঠানে—নিম্নে এ ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে।
- কোনো মানত পূর্ণ করার সময়।

এ ব্যাপারটি নবিজি ﷺ-এর জীবদ্দশায় একটি বিশেষ ঘটনা থেকে উৎপত্তি হয়েছে যা আমাদের বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। অধিকন্তু, দফ্-সম্পর্কিত সকল বর্ণনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, শুধু নারী ও শিশুরাই দফ্ বাজাবে। সুতরাং, আজকের দিনের বিয়ের অনুষ্ঠানে পুরুষদের গান, বাদ্য এবং নৃত্য করার যে প্রচলন তা সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী।

অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত হলো

- যে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে: দফ্
- যে সকল উপলক্ষে ব্যবহার করা যেতে পারে: দুই 'ঈদ এবং বিয়ের অনুষ্ঠান
- যারা বাজাতে পারবে: নারী ও শিশুরা

---

[৭১] হাদীসটি আল-বুখারি (ফাত'হুল বারী, হাদীস নং ৫৫৯০) এবং ইবনু হিব্বান সহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫৪৬৬; আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৯১)।

[৭২] হাদীসটি আহ্‌মাদ এবং আত-তিরমিযিসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫৪৬৭; আস-সহীহাহ, হাদীস নং ২২০৩)।

বিয়ের অনুষ্ঠানে দফ্ বাজানো এবং গান গাওয়া

বিয়ে অনুষ্ঠান উপলক্ষে দফ্ বাজিয়ে তার সাথে সাথে গান গাওয়া শুধু মহিলাদের জন্য অনুমোদিত একটি রীতি। আইশাহ ﷺ বর্ণনা করেন, একজন আনসার পুরুষের সাথে বিয়ের জন্য একজন পাত্রীকে তিনি সাজিয়ে দিলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন:

> "হে 'আইশাহ, তোমাদের কি লাহ্ওয়া (গান ও নৃত্য)-এর ব্যবস্থা ছিল না? আনসাররা সত্যিই লাহ্ওয়া পছন্দ করে।"[৭৩]

যা গাওয়া হবে তা সরল ও নিষ্পাপ শব্দের হতে হবে। জৈবিক ও মানসিক উদ্দীপনা জাগায়, পাপাচার এবং আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণে কুমন্ত্রণা দেয় এমন কিছু বর্জনীয়। খেয়াল রাখা জরুরি, তখনকার দিনে গাওয়া বলতে কেবল কবিতা আবৃত্তির সাথে মাঝে মাঝে দফ্ বাজানোকেই বোঝাত। এতে কোনো স্বরলিপি অনুসরণ করা হতো না। কামোদ্দীপক এবং কুরুচিপূর্ণ কোনো শব্দ বা যৌন সুড়সুড়িদায়ক কোনো অঙ্গভঙ্গি থাকত না। আইশাহ ﷺ থেকে বর্ণিত অন্য এক হাদীসে নবিজি ﷺ বলেছেন:

> "কনের সাথে ছোট্ট একটা মেয়েকে পাঠানো কি উচিত ছিল না, যে দফ্ বাজাত এবং গাইত।"
>
> আইশাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "সে কী গাইবে?" তিনি ﷺ বললেন:
>
> বলবে,
>
> "আমরা এসেছি তোমাদের কাছে, আমরা এসেছি তোমাদের কাছে।
> তাই তো আমাদেরকে স্বাগত জানাও, আর আমরাও তোমাদেরকে সম্ভাষণ জানাবো।
> যদি লাল স্বর্ণ না হতো
> তা হলে তোমাদের মরুভূমিগুলো নির্জনই পড়ে থাকত
> আর যদি গাঢ় ফসল না থাকত
> তা হলে কুমারী মেয়েগুলো স্বাস্থ্যহীন থাকত।"[৭৪]

নৃত্য করা

আমরা ওপরে দেখলাম, নবিজি ﷺ বিয়ে অনুষ্ঠান উপলক্ষে লাহ্ওয়া-এর ব্যাপারে মহিলাদের অনুমতি দিয়েছেন। লাহ্ওয়া হলো দফ বাজিয়ে গান গাওয়া। নৃত্যকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তবে এই নৃত্য শুধু দফের শব্দের সাথে তাল মিলিয়ে মৃদুএবং

---

[৭৩] আল-বুখারিসহ অন্যান্যরা হাদীসটি সংকলন করেছেন।

[৭৪] হাদীসটি আত-তাবারানি সহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া' আল-গালীল, হাদীস নং ১৯৯৫, আদাবুয্ যিফাফ, পৃষ্ঠা ১৮১)।

নিষ্কলুষ দেহভঙ্গি মাত্র। এই নৃত্য কখনোই ওই কামোদ্দীপক এবং যৌন-সুড়সুড়ি জাগানিয়া নাচানাচি নয়, যা আজকাল বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে করা হয়ে থাকে।

উপহার দেওয়ার সঠিক নিয়ম

সব উপলক্ষেই উপহার দেওয়াটা একটি উত্তম চর্চা। আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহ রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "উপহার বিনিময় করো—এটি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসার সঞ্চার করবে।"[৭৫]

নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে নববিবাহিত দম্পতিকেও উপহার দেওয়া যেতে পারে:

বিয়ের অনুষ্ঠানে এই ধরনের উপহার দেওয়াকে বাধ্যতামূলক রীতি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না, যেমন: উপহার-সামগ্রী গ্রহণের লক্ষ্যে ঘটা করে কোনো আয়োজন করা, যাতে আমন্ত্রিত অতিথিরা পাত্রীর জন্য উপহার নিয়ে আসে।

উপহার এমন হতে হবে যেগুলো ইসলামে বৈধ। কোনো ধরনের মূর্তি বা ভাস্কর্য, কোনো বাদ্যযন্ত্র, বাঁশী বা এই জাতীয় কোনো নিষিদ্ধ সামগ্রী উপহারের মধ্যে থাকবে না।

এই নির্দেশনাগুলো মাথায় রেখে সুচিন্তিত পছন্দের মাধ্যমে উপহার সামগ্রী প্রদান করলে নববিবাহিত দম্পতির নতুন সংসার সাজাতে সেগুলো খুবই সহায়ক হতে পারে।

পাপে ভরা বিয়ে-অনুষ্ঠান

আজকাল বিয়ের অনুষ্ঠানে মুসলিমরা প্রায়ই সুমহান আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করা সহ নানা পাপে লিপ্ত হয়। অনেকে ধরে নেয়, বিয়ের অনুষ্ঠান এমন একটি উপলক্ষ যেখানে কিছু ইসলামী নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করা যায়। এই অংশে আমরা এমনই কিছু বিরুদ্ধাচরণের ওপর আলোকপাত করব। সেই সাথে মুসলিমদেরকে আহ্বান জানাবো তারা যেন নিজেদের বিয়ের অনুষ্ঠানে এসব কাজ দৃঢ়ভাবে পরিহার করেন এবং যেসব অনুষ্ঠানে এমনটি হয় সেগুলোকেও দৃঢ়ভাবে পরিহার করেন।

আমরা বিশেষভাবে নবদম্পতি এবং তাদের পরিবারগুলোকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, বিয়ের মধ্য দিয়ে দুজন মানুষের একটি নতুন জীবনের সূচনা হয়। অতএব এই জীবনে

---

[৭৫] হাদীসটি আবা ইয়া'লা, আল-বায়হাকি এবং আল-বুখারি (আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে) সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৬০১)।

পদার্পণটা যেন সর্বোত্তম পন্থায় হয়, সেজন্য সব রকমের পদক্ষেপ নিতে হবে, তাদের প্রতিপালকের অনুগত থেকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের আশান্বিত হতে হবে। তাদের পাপাচার থেকে বাঁচার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে, যাতে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে কঠিন শাস্তির মধ্যে পড়তে না হয়।

বিয়েতে অনৈসলামী বেশ-ভূষা

বিয়ের অনুষ্ঠানে বেশ-ভূষা এবং সাজসজ্জার ব্যাপারে মুসলিমদেরকে নিম্নোক্ত নির্দেশনাগুলো সব সময় বিবেচনায় রাখতে হবে:

শরীরের যেসব লোম রেখে দেওয়ার হুকুম, সেগুলো না ফেলা। নারীদের ভ্রূ তুলে ফেলা এবং পুরুষদের দাড়ি চেঁছে ফেলা বা একেবারে ছোট করে কাটা।

তাদের উচিত অমুসলিম এবং পথভ্রষ্টদের রীতিনীতি অনুসরণ না করা। যেমন: নায়িকা, গায়িকা, মডেল, নর্তকীদের মতো বিচিত্র ঢঙে চুল ছেঁটে তাদের সদৃশ পোশাক-পরিচ্ছদ ধারণ করা।

মহিলারা সুগন্ধি লাগাতে পারবে যদি কেবল তারা অন্যান্য মহিলাদের সাথে বা তাদের কোনো মাহ্‌রামের সাথে থাকে। গায়ের মাহ্‌রামদের উপস্থিতিতে সুগন্ধি লাগালে তাতে বড় ধরনের পাপ হবে। আবু মুসা আল আশ'আরি ﷺ বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

> "যে নারী সুগন্ধি মেখে পুরুষদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা তার সুগন্ধ পায়, সে নারী ব্যভিচারিণী।"[৭৬]

মহিলাদের এমন কোনো রূপচর্চা করা উচিত নয় যা তাদের প্রকৃত চেহারার পরিবর্তন ঘটায়। যেমন হাত-পা-এর নখ বড় করা, এগুলোতে নেইল পলিশ দেওয়া, ভ্রূ তোলা, চোখের মণির বর্ণ পরিবর্তন করা, শরীরের কোথাও ট্যাটু বা উল্কি আঁকা, অথবা এমন কোনো মেকআপ দেওয়া যা শরীরের ত্বকের রং পরিবর্তিত করে। এগুলো ত্বকের ক্ষতি সাধন করে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

---

[৭৬] হাদীসটি আবু দাউদ এবং আত-তিরমিযিসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৭০১; আল-মিশকাত, হাদীস নং ১০২৩)।

তবে চোখের রেখা আঁকার জন্য প্রাকৃতিক কুহ্‌ল (সুরমা) ব্যবহার করার অনুমতি আছে। সাহাবাগণ এমনটি করে থাকতেন এবং 'আলী ﷺ বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

> "তোমরা সুরমা লাগাও; এটি চোখের পাঁপড়ি গজাতে সাহায্য করে, চোখের অশুদ্ধতা দূর করে এবং দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে।" [৭৭]

মেহেদি ব্যবহার করার অনুমতি আছে। মেহেদি হলো লালচে কমলা রঙের এক ধরনের প্রসাধন যা মেহেদি গাছের পাতা এবং কাণ্ড থেকে পাওয়া যায়। নবীর ﷺ গৃহ পরিচারিকা সালমা বর্ণনা করেন:

> "চোট পেলে, কাঁটা ফুটলে নবিজি ﷺ প্রতিটি ক্ষেত্রে মেহেদি লাগাতেন।" [৭৮]

মুসলিমদেরকে উল্কি আঁকা এবং শরীর ছিদ্র করা বর্জন করতে হবে। ইসলামে এসব কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। এগুলো স্পষ্টতই শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে ঘটে যা কেবল সাম্প্রতিককালে পথভ্রষ্ট এবং বিকৃত রুচির মানুষদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

মুসলিমদের আভিজাত্য এবং মিতব্যয়িতার মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। ফলে কখনোই এমন কোনো পোশাক এবং সাজসজ্জা গ্রহণ করা যাবে না যা অপব্যয় বা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে। তাদের স্মরণে থাকা উচিত, তারা এক রাতের একটি পোশাক বা এক জোড়া জুতোর জন্য যে টাকা খরচ করবে, সেই টাকাই পৃথিবীর অন্য কোনো প্রান্তের না-খেয়ে থাকা মুসলিমের জীবন বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

অহংকার প্রকাশ করার জন্য এবং লোক দেখানোর জন্য কোনো পোশাক পরা এবং সাজসজ্জা করা তাদের উচিত নয়।

তাদের পোশাক এমন হতে হবে যা সম্পূর্ণ 'আওরাহ্ আচ্ছাদিত করবে এবং দেহ কাঠামোকে গোপন রাখবে। নিম্নের ছকে আওরাহ্'র পরিসীমা দেওয়া হলো:

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি	আওরার পরিসীমা
পুরুষ বা নারীদের উপস্থিতিতে পুরুষ	নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত

[৭৭] হাদীসটি আত-তাবারানি এবং আবু নুয়া'ইমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ২৭০১)।

[৭৮] হাদীসটি আত-তিরমিযি এবং ইবনু মাজাহ্ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ২০৫৯; আল-মিশকাত, হাদীস নং ৪৪৬৭)।

গায়ের মাহ্‌রাম বা অমুসলিম নারীদের উপস্থিতিতে নারী	দুহাত (কব্জি পর্যন্ত) এবং মুখমণ্ডল ব্যতীত পুরো শরীর
মাহ্‌রাম বা মুসলিম নারীদের উপস্থিতিতে মুসলিম নারী	মাথা, ঘাড়, কনুই পর্যন্ত দুহাত এবং জঙ্ঘাস্থি ব্যতীত পুরো শরীর।

আওরাহ্ আবৃত রাখার নিয়মের লঙ্ঘন হয় এমন কিছু উদাহরণ হলো—পুরুষদের হাফপ্যান্ট বা আঁটসাঁট প্যান্ট পরা; নারীদের গায়ের মাহ্‌রামদের সামনে মাথা, কনুই পর্যন্ত বাহু উন্মুক্ত রাখা অথবা আঁটসাঁট (স্কিন টাইট), স্বচ্ছ (যে কাপড়ের ভেতর দিয়ে শরীর দেখা যায়) কিংবা এমন কোনো রগরগে পোশাক পরা যা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; ঊরু, বগল কিংবা বক্ষদেশের অংশ-বিশেষ উন্মোচিত রাখা, পায়ের টাখনুর নীচ থেকে উপরিভাগের বেশ কিছু অংশ উন্মোচিত রাখা ইত্যাদি।

মুসলিমরা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করবে না। যেমন: নারীদের পুরুষদের মতো পোশাক পরিধান করা কিংবা পুরুষের রেশমবস্ত্র, স্বর্ণালংকার, গলার হার বা মালা, কানের দুল, হাতের চুড়ি, মাথার চুলের বেল্ট ইত্যাদি পরিধান করা। এদের প্রতি রয়েছে নবিজি ﷺ-এর সুস্পষ্ট অভিসম্পাত।

বিয়েতে অনৈসলামী কার্যকলাপ

মুসলিমদেরকে তাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে আরও অনেক অনৈসলামী ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকবে হবে। বিশেষভাবে নিম্নোক্ত ক্রিয়াকলাপ থেকে:

পরস্পরের মাহ্‌রাম নয় এমন নারী-পুরুষের মেলামেশা পরিহার করতে হবে। কারণ, এর মাধ্যমে অনেক পাপ সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন—

- একে অন্যকে স্পর্শ করা, আলিঙ্গন করা বা করমর্দন করা।
- পরস্পরের সাথে ঠাট্টা-তামাশা, খোশগল্প বা কোনো রকম মাখামাখি করা।
- একে অন্যের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করা বা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা।
- বরযাত্রীসহ পাত্রকে বিয়ের অনুষ্ঠানে নারীদের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রবেশ করতে দেওয়া।
- বর-কনেকে সাজিয়ে উন্মুক্ত স্থানে খোলা মঞ্চে সকলের প্রদর্শনীর জন্য উপস্থাপন করা।

- মুসলিমদের উচিত অপব্যয় না করা বা বিয়ের অনুষ্ঠানকে কোনো লোক-দেখানোর প্রদর্শনী বানিয়ে না ফেলা; যেখানে সমস্ত টাকা-পয়সা এমন খাতে ব্যয় করা হয় যার মধ্যে মুসলিমদের জন্য কোনো কল্যাণ নেই। যেমন:
- কোনো ব্যয়বহুল হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল কিংবা নাচঘরে বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, যেখানে চোখ-ধাঁধানো আলোক-সজ্জা করা হয়, অঢেল খাবার-দাবার পরিবেশন করা হয় এবং ইসলাম-পরিপন্থী ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়।
- আমন্ত্রিতদের মাঝে চড়াদামের মোড়ক-ভর্তি মিষ্টান্ন বিতরণ করা অথবা তাদের মাঝে রৌপ্য বা স্বর্ণের মুদ্রা ছড়ানো, যাতে 'সৌভাগ্যবানরা' সেগুলো লুফে নিতে পারে।
- বিয়ের জন্য পাত্রীর অত্যন্ত উচ্চমূল্যের বিশেষ পোশাক পরিধান করা যাতে তার আওরার অধিকাংশই প্রকাশিত বা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

মুসলিমদেরকে সেইসব পাপ-কাজগুলোও বর্জন করতে হবে যেগুলো অমুসলিমদের বিয়ের অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য। যেমন:

- অনুষ্ঠানে খাদ্য পরিবেশন ও সেবাদানের জন্য অনৈসলামী পোশাক পরিহিতা নারীদের উপস্থিত রাখা।
- গান-বাজনা বা লাইভ কনসার্টের পাশাপাশি অশালীন ইঙ্গিতপূর্ণ ও কামোদ্দীপক নৃত্য করা।
- মদ ও মদজাতীয় পানীয় পরিবেশন করা।
- নববিবাহিত দম্পতির উভয়ে তাদের নতুন 'বিয়ে-চিহ্ন' হিসেবে বিয়ের আংটি পরিধান করে থাকা। ইসলামে উল্লিখিত ধরনের চর্চার কোনো রকম অনুমোদন নেই।

বিয়ের নামে ইসলামের কোনো ফরয হুকুমকে তারা লঙ্ঘন করতে পারবে না। যেমন:

- সালাত কাযা করা কিংবা জামা'আতে সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকা।
- অনেক রাত পর্যন্ত বিয়ের অনুষ্ঠান চালু রাখা; যার কারণে আমন্ত্রিত অতিথিদের ফজরের সালাত কাযা হয়ে যেতে পারে।

ছবি তোলা থেকে বিরত থাকা

জরুরি প্রয়োজন ছাড়া একজন মুসলিমের ছবি তোলা, ভিডিও করা, লাইভ টেলিকাস্ট করা উচিত নয়। আইশাহ ﵂ বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ একবার তার ঘরে ছবিযুক্ত একটি পর্দা দেখলেন। এতে তাঁকে বেশ রাগান্বিত দেখা গেল এবং তিনি বললেন:

> "নিশ্চয়ই যারা এই ধরনের ছবি তৈরি করে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বলা হবে, 'যা তৈরি করেছ তাতে জীবন দান করো'।"
>
> তাই তিনি পর্দাটি সরিয়ে নিলেন এবং কেটে তা দিয়ে কিছু বালিশ বানালেন।[৭৯]

ইবনে মাস'ঊদ ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন যেসব লোকেরা সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাবে তারা হলো ছবি প্রস্তুতকারী।"[৮০]

আবু তালহা এবং 'আলীসহ অন্যান্যরা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নিশ্চয়ই যে বাড়িতে কোনো কুকুর বা জীবের ছবি থাকে সেই বাড়িতে (রহমতের) ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।"[৮১]

উল্লিখিত হাদীসগুলো সব ধরনের ছবির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের জীবন আছে। এমনকি সেগুলো কাল্পনিক হলেও। এগুলো হতে পারে দ্বিমাত্রিক কিংবা ত্রিমাত্রিক, হতে পারে আলোকচিত্র অথবা হাতে আঁকা কোনো চিত্রকর্ম।

একটি অতি প্রচলিত আধুনিক রীতি হলো বিয়ের উৎসবের সময় নববিবাহিত দম্পতিসহ তাদের বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজন মিলে অসংখ্য ছবি তোলা এবং এগুলোর ভিডিও-চিত্র ধারণ করা। এই ছবিগুলোতে থাকে সুমহান আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণমূলক ক্রিয়াকলাপ দৃশ্য। যেমন: নারীরা তাদের মাথার চুলসহ শরীরের অন্যান্য অংশ উন্মোচিত রেখে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি করে এমনসব পুরুষদের সাথে ছবি তোলে, যারা তাদের মাহ্‌রাম নয়। কাজেই, একদিকে যেমন কোনো রকম প্রয়োজন ছাড়াই এসব ছবি তোলা হচ্ছে, তার ওপর ছবির দৃশ্যের মাধ্যমে স্পষ্ট পাপাচার এবং আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ প্রতিফলিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে বছরের পর বছর ধরে

---

[৭৯] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[৮০] হাদীসটি মুসলিম এবং আহ্‌মাদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[৮১] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

নিজেসহ অন্যরা দেখার জন্য মানুষের পাপাচারকে তারা 'স্মৃতির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে'। এতে করে বিচারের দিন পর্যন্ত তাদের হিসাবের খাতায় পাপ যুক্ত হতে থাকে।

একসাথে পথচলা

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অংশীদারিত্বপূর্ণ কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত একটি চুক্তির নাম 'বিয়ে'। বিয়ে তাদের মাঝে একটি অংশীদারিত্বপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি করে যে সম্পর্কটিতে উভয়কেই নিজ নিজ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। এভাবেই হাতে হাত রেখে জীবনপথের সকল বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে মিলেমিশে সামনে এগিয়ে যেতে হয়।

পুরুষ হলো সংসারের প্রধান কর্তা। নারী তার সহযোগী। আপন ভুবনে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে পারঙ্গম নারীকে সংসারের অনেক কাজই সামলাতে হয়, যা পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার পশ্চিমা ভাবাদর্শে প্রভাবিত হয়ে কিছু নারী পুরুষকে ডিঙিয়ে পরিবারের কর্তা হতে চায়—এটাও উচিত নয়। এ রকম অস্বাভাবিক ও নিয়মবিরুদ্ধ চর্চার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে এসব পরিবারে দেখা দেয় চরম বিশৃঙ্খল ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি।

স্বামী ও স্ত্রী প্রত্যেকের রয়েছে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য। একটি সুখী ও সার্থক দাম্পত্য-জীবনের নিশ্চয়তা স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য পালন, তাদের পারস্পরিক অধিকার সংরক্ষণ ও পরস্পরের প্রতি আস্থা-বিশ্বাসের মাঝেই নিহিত। এসবের কোনোরূপ লঙ্ঘন পরিবারের নিশ্চিত বিপর্যয় ও ব্যর্থতার পথকে উন্মুক্ত করে দেয়।

যৌথ দায়িত্ব, যৌথ প্রতিদান

এমন কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য রয়েছে যেগুলো নারী এবং পুরুষ উভয়ের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর হুকুম-আহ্‌কাম পালন করার যে দায়িত্ব, তা উভয়ের জন্য সমান। অনুরূপভাবে, তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী এবং নিজেদের কর্মের ব্যাপারে প্রত্যেককেই আলাদা আলাদাভাবে জবাবদিহি করতে হবে। দীনের সঠিক জ্ঞানার্জন করা, আল্লাহর

ইবাদত করা এবং মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা উভয়ের জন্যই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিকতার মানদণ্ডও উভয়ের জন্য একই। অন্য মানুষদের সাথে চলাফেরা এবং আচার-আচরণের ক্ষেত্রেও অনেক নিয়ম-কানুন তাদের উভয়কেই একইভাবে অনুসরণ করতে হয়।

আল্লাহর আনুগত্য করলে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই রয়েছে একই পুরস্কার। পক্ষান্তরে, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কিংবা পাপ করলে উভয়ের জন্যই রয়েছে একই শাস্তি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

« যে নেক 'আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, যদি সে ঈমানদার হয়, তবে আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবো।[৮২] »

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ﴾

« তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কোনো পুরুষ অথবা মহিলা 'আমলকারীর 'আমল নষ্ট করব না। তোমরা একে অপরের অংশ।[৮৩] »

যেহেতু নারী-পুরুষ উভয়েই বাড়ির কর্তা ও কর্ত্রী; তাই পরিবার গঠন ও তার প্রতিপালনে তাদের উভয়কেই দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেহেতু তারা উভয়েই তাদের স্ব স্ব কর্তব্যের ধারক ও বাহক, তাই উভয়কেই নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। ইবনু 'উমার বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। শাসক (তার প্রজার ওপরে) দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্বামী তার পরিবারের ওপরে দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী-সংসারের ওপর দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। চাকর তার মালিকের ধন-সম্পদের ওপর দায়িত্বশীল এবং সে তার

[৮২] আন-নাহ্‌ল, ১৬:৯৭।

[৮৩] আলে-'ইমরান, ৩:১৯৫।

দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদের ওপর দায়িত্বশীল এবং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। এভাবেই তোমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৮৪]

নারী-পুরুষের কার কাঁধে কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সে ব্যাপারে তাদের একটি স্বচ্ছ এবং সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অতীব জরুরি। এই ধারণা তাদেরকে কঠোর সচেতন ও পরিশ্রমী করে তুলবে এবং তাদের লক্ষ্য পূরণে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে উদ্বুদ্ধ করবে, যাতে তারা বিচার দিবসে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হয়।

সাম্য ও সমতার সমীকরণ

নারী ও পুরুষের মাঝে তুলনা করার সময় আমাদের উপলব্ধি করা উচিত, সৃষ্টিগতভাবে যেহেতু তারা একই প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয়, তাই ইসলাম তাদেরকে কখনোই সমান বলে স্বীকৃতি দেয় না। এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোতে পুরুষকে নারীর ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই তার উল্টোটাও ঘটেছে। কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাদের আপন আপন সামর্থ্য থেকেই এসব অগ্রাধিকারের উৎপত্তি হয়েছে। অতএব যারা কখনোই সমান নয়, তাদেরকে সমান বলে প্রতিষ্ঠিত না করে বরং আমাদের উচিত হবে নারী ও পুরুষের মাঝে সাম্যের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া।

উত্তম আচরণ ও তার বৈশিষ্ট্য

নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর অর্পিত দায়িত্বের একটি বড় অংশ হলো—তারা বাড়িতে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করবে এবং উত্তম আচরণসহ জীবন যাপন করবে। দীন ইসলামের অনন্য বৈশিষ্ট্যই হলো উত্তম আচরণ। আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।"[৮৫]

---

[৮৪] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[৮৫] হাদীসটি ইবনু সা'আদ এবং আল-হাকিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৩৪৯ এবং আস-সাহীহাহ, হাদীস নং ৪৫)।

লক্ষণীয়, ইসলামে 'উত্তম আচরণ' কেবল সত্যবাদিতা, দয়া, উদারতাসহ অন্যান্য সাধারণ কিছু চারিত্রিক গুণাবলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর হুকুম পালনের মাধ্যমে তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করা, নবিজি ﷺ-কে অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করা এবং সর্বোপরি অন্য সকল মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করাও 'উত্তম আচরণের' অন্তর্ভুক্ত। নবিজি ﷺ-এর পরে সর্বোত্তম মানুষ হলেন তারাই যাদের আচরণ উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর رضي الله عنه বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

> "নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তারাই যারা সর্বোত্তম আচরণের অধিকারী।"[৮৬]

এ ছাড়া আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

> "মু'মিনদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম হলো তারাই যারা সর্বোত্তম আচরণের অধিকারী।"[৮৭]

জীবনে সর্বক্ষেত্রেই একজন মুসলিমকে উত্তম আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। তার এই বৈশিষ্ট্য তাকে অন্য সব মুসলিমদের মাঝে সর্বোচ্চ সম্মানের আসনে আসীন করবে। উত্তম আচরণের কারণে একজন মু'মিন রাসূল ﷺ-এর প্রিয়পাত্র হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেন এবং তার ও জান্নাতের মাঝের দূরত্বও কমে আসে। আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "বিশেষভাবে যে বিষয়গুলো মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে তা হলো আল্লাহর তাক্ওয়া এবং উত্তম আচরণ। আর বিশেষভাবে যে বিষয়গুলো মানুষকে আগুনে প্রবেশ করাবে তা হলো মুখ এবং লজ্জাস্থানসমূহ।"[৮৮]

দূরসম্পর্কের লোকজনের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রেই কেবল উত্তম আচরণ করাকে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়; বরং নিকটাত্মীয়দের সাথেও উত্তম আচরণের সর্বোত্তম বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে। এর চেয়েও গুরুত্বের বিষয় হলো—স্বামী-স্ত্রী তাদের পারস্পরিক আচার-ব্যবহারে উত্তম আচরণের সর্বোচ্চ মান বজায় রাখবে। পরিবারের মধ্যেই একজন মানুষের মুখোশহীন সত্যিকার চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কারণ,

---

[৮৬] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[৮৭] হাদীসটি ইবনু মাজাহ এবং আল-হাকিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ১১২৮ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৩৭৪)।

[৮৮] হাদীসটি আত-তিরমিযি, আহমাদ এবং ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি হাসান বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৯৭৭)।

একজন মানুষ অন্য মানুষের সামনে যে আচার-ব্যবহার ও আনুষ্ঠানিকতা বজায় রেখে চলে, তা পরিবারের মধ্যে বজায় রেখে চলে না।

কাজেই উত্তম আচরণ পাওয়া যেমন স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার, তেমনি পরস্পরের প্রতি উত্তম আচরণ করাও তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে নিবিড় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বিষয়টি প্রতিফলিত হয়। এটি তাদের মাঝে একটি কল্যাণময় সম্পর্কের জন্য অত্যাবশ্যক। আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "মু'মিনদের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণ ঈমানের অধিকারী তারাই যাদের চরিত্র সবচেয়ে পরিশীলিত। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তারাই যারা তাদের স্ত্রীদের কাছে সর্বোত্তম।"[৮৯]

অতএব নিজের স্বামী বা স্ত্রীর সাথে আচরণ করার সময় সর্বক্ষেত্রেই উত্তম আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। এই বিষয়ে সবিস্তরে আলোচনা করতে গেলে এই বইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তা সংকুলান করা যাবে না। তথাপি, নিম্নের অনুচ্ছেদগুলোতে কিছু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করব যে বৈশিষ্ট্যগুলো পারিবারিক পরিমণ্ডলে অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

সত্যবাদিতা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের অনেক জায়গায় সত্যবাদীদের প্রশংসা করেছেন এবং সত্যবাদিতাকে মু'মিনদের একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।[৯০] অন্যদিকে, মিথ্যাচারীদের নিন্দা করেছেন এবং মিথ্যাচারকে মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বলে সাব্যস্ত করেছেন।[৯১]

অধিকন্তু, নবিজি ﷺ সত্যবাদিতার প্রশংসা করেছেন এবং তা জান্নাতে নিয়ে যায় বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, তিনি মিথ্যাচারকে নিন্দা করেছেন এবং তা জাহান্নামে নিয়ে যায় বলে উল্লেখ করেছেন।

সত্যবাদিতা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। আর যেকোনো অংশীদারিত্বপূর্ণ সম্পর্কের সাফল্যের জন্য এটা অত্যাবশ্যক উপাদান। আর

---

[৮৯] হাদীসটি আত-তিরমিযি এবং ইবনু হিব্বান সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ১২২৩ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ২৮৪)।

[৯০] উদাহরণস্বরূপ, আত-তাওবাহ, ৯:১১৯ দেখুন।

[৯১] উদাহরণস্বরূপ, আল- মুনাফিকূন, ৬৩:১ দেখুন।

বিয়েও এর ব্যতিক্রম নয়। পক্ষান্তরে, মিথ্যাচার ও প্রতারণার ফলে তৈরি হয় এক অনিশ্চিত সম্পর্কের যা নিমেষেই ভেঙে যেতে পারে। কিছু মানুষ একটি ভ্রান্ত ধারণা বয়ে বেড়ায়, নিজের স্বামী বা স্ত্রীর সাথে যত খুশি মিথ্যা বলা যায়। এই ভ্রান্ত ধারণার জন্ম হয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসটির অপব্যাখ্যা থেকে:

উম্মু কুলসুম বিন্‌তে 'উকবাহ্ ﵂[৯২] বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আমি তাকে মিথ্যাবাদী বলে মনে করি না—যে ব্যক্তি (মতবিরোধে লিপ্ত) লোকজনের মধ্যে মধ্যস্থতা করে, যে বিরোধ মীমাংসা করার স্বার্থে কোনো (মিথ্যা) কথা বলে, যে ব্যক্তি যুদ্ধকালীন (শত্রুকে) কোনো (মিথ্যা) কথা বলে, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে খোশগল্প করে এবং যে নারী তার স্বামীর সাথে খোশগল্প করে।"[৯৩]

উল্লিখিত হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট, স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে মিথ্যা বলা তাদের মনোমুগ্ধকারী খোশগল্পের মাঝেই সীমাবদ্ধ। এ ধরনের মিথ্যা বলার পরিস্থিতিটা এমন হতে পারে যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে—'তোমার চেয়ে ভালো রান্না আর কেউ করতে পারে না!' কিংবা 'তোমার পোশাকটিই সবচেয়ে সুন্দর!' কিংবা 'আজ তোমায় দারুণ লাগছে!' অথবা যখন স্ত্রী তার স্বামীকে বলে, 'আমাকে দেওয়া তোমার উপহারটাই সবচেয়ে সুন্দর!' কিংবা পরস্পরের মনোরঞ্জনের জন্য বানিয়ে কোনো গল্প বলে ইত্যাদি। এমনকি এসব পরিস্থিতিতেও উত্তম হলো, সরাসরি মিথ্যা না বলে আলংকারিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া অর্থাৎ উক্তিটি এমন হওয়া যেন সেটির দুধরনের অর্থ করা যায় এবং কম করে হলেও একটি অর্থ সত্য হয়।

কোমল আচরণ ও মমত্ববোধ

সম্মানজনক সদয় আচরণ পাওয়া স্ত্রীর অধিকার। স্বামীর পক্ষ থেকে এটি কোনো ঐচ্ছিক অনুগ্রহ নয়; বরং স্বামীর এই আবশ্যিক কর্তব্য আসমানি নির্দেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। যে বিষয়ে স্বামীর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই (মনের ইচ্ছা), তা কোনোভাবেই যেন স্ত্রীর প্রতি তার আচরণকে প্রভাবিত না করে। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন:

﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

---

[৯২] তিনি আব্দুর রহমান ইবনু 'আউফের ﵁ স্ত্রী।

[৯৩] হাদীসটি আবু দাউদ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৫৪৫ এবং সহীহুল জামে', হাদীস নং ৭১৭০)।

« তোমরা তাদের (তোমাদের স্ত্রীদের) সাথে সদ্ভাবে বসবাস করো। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে এমনও হতে পারে, তোমরা কোনো কিছুকে অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[৯৪] »

স্ত্রীর প্রতি মমত্ববোধ স্বামীর উত্তম চরিত্র এবং তার সৎকর্মশীল হওয়ার পরিচায়ক। স্ত্রীর সাথে একজন সৎকর্মশীল মু'মিনের আচরণ কেমন হওয়া উচিত তার অনুপম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছেন নবিজি ﷺ। আইশাহ رضي الله عنها বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো তারাই যারা তাদের পরিবারের নিকট উত্তম, আর তোমাদের মধ্যে আমিই আমার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম।"[৯৫]

বিনম্রতা মুসলিম চরিত্রের একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ। এমনকি আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের প্রতি নম্রতা দেখানোর জন্য তাঁর রাসূল ﷺ-কে নির্দেশ দিয়েছেন।[৯৬] 'আইয়াদ ইবনু হিমার رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন, তোমরা অবশ্যই বিনম্রতা প্রদর্শন করবে যাতে করে তোমাদের কেউ একজন আরেক জনের ওপরে দম্ভ না করে এবং তোমাদের কেউ একজন আরেক জনের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘন না করে।" [৯৭]

বিষয়টি স্বামী-স্ত্রীদের ভালো করে বুঝতে হবে। তাদেরকে পরস্পরের প্রতি বিনম্রতা প্রদর্শন করতে হবে। ধন-সম্পদ, সামাজিক অবস্থান, বিদ্যা-বুদ্ধি, সৌন্দর্য, আত্মীয়-স্বজন, বংশের আভিজাত্য ইত্যাদি ছাড়াও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আরও যেসব অনুগ্রহ দান করেছেন সেগুলো নিয়ে তারা বড়াই করতে পারবে না। বিশেষ করে যুক্তিতর্কের সময় দম্ভ প্রকাশ করা অজ্ঞতার ও বুদ্ধিবৃত্তিক অপরিপক্কতার লক্ষণ, যা তাদের উভয়ের জন্যই নিন্দনীয় এবং পরিত্যাজ্য।

একে অন্যের প্রতি সর্বোচ্চ মাত্রায় সহমর্মিতা এবং মমতা প্রদর্শন করা স্বামী-স্ত্রীর অবশ্যকর্তব্য। তাদের উচিত নিজেদের ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা এবং পরস্পরকে শুধরে দেওয়া।

---

[৯৪] আন-নিসা, ৪:১৯।

[৯৫] হাদীসটি আত-তিরমিযি এবং ইবনু হিব্বানসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ২৮৫)।

[৯৬] আশ-শুআরা, ২৬:২১৫

[৯৭] হাদীসটি মুসলিম এবং আবু দাউদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

দয়াশীল ব্যক্তিই আল্লাহর দয়ার যোগ্য। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "দয়ালু মানুষকে পরম দয়াময় (আল্লাহ) দয়া করেন। যারা পৃথিবীতে আছে তাদের প্রতি দয়া করো, তা হলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"[৯৮]

অনুরূপভাবে, অসীম দয়ালু আল্লাহ দয়াকারীকে ভালোবাসেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে দয়ার প্রতিদানও হলো অফুরন্ত। যেকোনো পরিস্থিতিতেই দয়ার প্রদর্শন ইতিবাচক এবং তা পরিস্থিতিকে মঙ্গলের দিয়ে নিয়ে যায়। আর নিষ্ঠুর আচরণের প্রভাব হয় তার উল্টোটা।

আইশাহ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "হে 'আইশাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ দয়াময়, এবং সবক্ষেত্রেই দয়াকে ভালোবাসেন। দয়ার জন্য তিনি এমন কিছু দান করেন যা নিষ্ঠুরতা বা অন্যকিছুর জন্য তিনি দান করেন না। হে 'আইশাহ, আল্লাহর ভয় এবং দয়াকে কাজে লাগাও, কারণ, নিশ্চয় কখনোই এমন কিছুর মধ্যে দয়া ছিল না যেটাকে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেনি এবং কখনোই দয়াকে সরিয়ে নেওয়ার ফলে এমন কিছু ছিল না যার সৌন্দর্যহানি হয়নি।"[৯৯]

বস্তুত একজন নির্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি অন্য কারও ক্ষতি করার পূর্বে নিজেই নিজের ক্ষতি বয়ে আনে। এই ধরনের মানুষ আল্লাহর দয়া এবং ক্ষমাশীলতাকে অস্বীকার করে। জারির ইবনু 'আব্দুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে দয়া থেকে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।"[১০০]

স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই দায়িত্ব হলো পরিবারে দয়া ও মায়ার লালন করা। নিজেদের মাঝে যেকোনো ধরনের সমস্যা এবং মতবিরোধ দেখা দিলে সেসবের নিরাময়ে প্রথমই দয়া-মায়ার প্রয়োগ করতে হবে। এতে শুধু তাদের সমস্যার সমাধানই হবে না; বরং তারা আল্লাহর দয়া এবং ভালোবাসার পাত্র হবে। উল্লিখিত হাদীসে এই কথাই বলা হয়েছে।

---

[৯৮] হাদীসটি আহমাদ এবং আবু দাউদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৩৫২২ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৯২৫)।

[৯৯] হাদীসটি একটি সম্মিলিত বর্ণনা যা আল-বুখারি, মুসলিম এবং আহমাদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৭৯২০, ৭৯২১ এবং ৭৯২৭)।

[১০০] হাদীসটি মুসলিম এবং আহমাদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

ক্ষমাশীলতা

একজন মুসলিমের প্রতিশোধ নেওয়া বা 'সমুচিত জবাব দেওয়ার' মনোভাব থাকা উচিত নয়। এতে তাদের নিজেদের মাঝে ঘৃণার জন্ম হয় এবং তাদের মধ্য থেকে ভালোবাসা ও নিরাপত্তাবোধ বিদায় নেয়। একজন মুসলিমের সর্বদা ক্ষমা করে দেওয়ার প্রবণতা থাকা উচিত। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রী এবং নিকটাত্মীয়দের প্রতি তাকে এমন মনোভাব পোষণ করা উচিত। ক্ষমাশীল ব্যক্তিই আল্লাহর ক্ষমালাভের যোগ্য। জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ ﷛ থেকে বর্ণিত উল্লিখিত হাদীসের অন্য একটি বর্ণনায় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে দয়া করে না, তার প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) দয়া করা হবে না। আর যে ক্ষমা করে না, তাকেও ক্ষমা করা হবে না।"[১০১]

অন্যায় আচরণ ও অশ্লীল ভাষা বর্জন করা

স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের প্রতি আচরণ হওয়া উচিত সুবিবেচনাপ্রসূত, সুবিচারপূর্ণ এবং ন্যায়সংগত। পরস্পরের প্রতি যেকোনো ধরনের অন্যায় আচরণ তাদের পরিহার করা উচিত। পরস্পরের অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা কিংবা নিজেদের অভ্যাসগত আচরণের কারণে পারস্পরিক অধিকারের অপব্যবহার করা উচিত নয়। অন্যায় আচরণ বা অবিচার করাকে আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন। এমনকি আল্লাহর নিজের ওপর নিজে অবিচার করা নিষিদ্ধ করে নিয়েছেন! আবু যর ﷛ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

> "আল্লাহ বলেন, 'হে আমার বান্দারা! নিশ্চয়ই আমি যুলুম করাকে আমার নিজের ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ করেছি এবং তোমাদের মাঝে তা নিষিদ্ধ করেছি, তাই তোমরা একে অন্যের প্রতি যুলুম কোরো না'।"[১০২]

যুলুম অবিচার অনেক বড় পাপ; এতে আল্লাহর ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং যা উভয় জীবনেই শাস্তি বয়ে আনে। জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷛ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

---

[১০১] হাদীসটি আহমাদ এবং আত-তাবারানি (আল-কাবির গ্রন্থে) সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৬৫৯৯ এবং ৬৬০০)।

[১০২] হাদীসটি মুসলিম সংকলন করেছেন।

> "তোমরা যুলুম পরিহার করো, কারণ, যুলুমের ফলেই কিয়ামতের দিন ঘোর অন্ধকারের সৃষ্টি হবে।"[১০৩]

নিজের অজান্তেই স্বামী বা স্ত্রীর মনে যেন কর্তৃত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ববোধ দানা বেঁধে না ওঠে। এতে একজন আরেক জনের প্রতি অন্যায় আচরণ করে ফেলবে এবং ভাববে, এটা করে সে অনেক বড় বিজয় অর্জন করেছে। তারা উভয়েই যেন উল্লিখিত হাদীসটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং অত্যাচারিত ব্যক্তির হৃদয়ের নীরব অভিশাপকে ভয় করে চলে। আনাস ইবনু মালিক ؓ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আকে ভয় করো, এমনকি সে যদি কাফিরও হয়; কারণ, তা (তার দু'আ) আল্লাহর নিকট পৌঁছতে কোনো বাধা নেই।"[১০৪]

অত্যাচারের কথা মানুষ কখনোই ভুলে যায় না এবং অত্যাচারীর শাস্তি প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। আবু হুরায়রা ؓ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "সম্পদ বা মানসম্মান নিয়ে কেউ যদি কারও ওপর অবিচার করে, তা হলে যেদিন কোনো টাকা-পয়সা থাকবে না, সেই দিন তার কাছে তা নিয়ে নেওয়ার আগে সে যেন আজই মাফ চেয়ে নেয়। সেদিন তার যদি কোনো ভালো কাজ থাকে, তা হলে তার অত্যাচারের বদলা হিসেবে তা নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি ভালো কাজ না থাকে, তা হলে অত্যাচারের স্বীকার হওয়া মানুষটার অপরাধ (পাপ) তার ওপর চাপানো হবে।"[১০৫]

দাম্পত্য-সম্পর্ককে সব ধরনের পঙ্কিলতা ও নোংরামি থেকে মুক্ত এবং পবিত্র রাখতে হবে। কথাবার্তা এবং শব্দচয়নে এই সম্পর্ক যেন স্বামী-স্ত্রীর জন্য এবং তাদের সন্তানদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে যায়। তাদের কথাবার্তায় শব্দচয়ন হবে এমন, যা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং সর্বোপরি মু'মিনদের কাছে পছন্দনীয়। আইশাহ ؓ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন:

> "হে 'আইশাহ, কথাবার্তায় অশ্লীল হবে না। যেলোক অশ্লীলতার আনন্দ পায়, সে ধরনের গর্হিত আচরণের লোককে আল্লাহ কক্ষনো ভালোবাসেন না।"[১০৬]

---

[১০৩] হাদীসটি মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[১০৪] হাদীসটি আহ্মাদ এবং আবু ইয়া'লাসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৭৬৭ এবং সহীহুল জামে', হাদীস নং ১১৯)।

[১০৫] হাদীসটি আল-বুখারি এবং আহ্মাদ সংকলন করেছেন।

[১০৬] হাদীসটি একটি সম্মিলিত বর্ণনা যা মুসলিম, আল-বুখারি ('আদাবুল মুফ্রাদ) এবং আবু দাউদ সংকলন করেছেন। (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৭৯৩৩, ৭৯২২ এবং ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং

তর্ক-বিতর্ক এবং বাগ্‌বিতণ্ডা বর্জন করা

কথায় কথায় তর্ক-বিতর্ক আর ঝগড়া-বিবাদ অবশ্যই বর্জন করতে হবে। কারণ, বিবাহিত দম্পতির পরস্পরের সম্পর্কের বন্ধন এতে ক্রমান্বয়ে শিথিল হতে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে—সর্বক্ষেত্রে নিজের মতটি সুপ্রতিষ্ঠিত করা এবং প্রত্যেকবার বিতর্কে নিজে বিজয়ী হওয়া অত্যাবশ্যাক নয়। নিজে সঠিক হওয়ার পরও যে ব্যক্তি বিতর্ক থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়, আল্লাহ্ ওই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি গৃহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবু উমামাহ্ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের প্রান্তসীমায় একটি ঘরের জিম্মাদার, যে তর্ক পরিত্যাগ করে, যদিও সে-ই সঠিক; এবং সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের মধ্যখানে একটি ঘরের, যে মিথ্যা পরিত্যাগ করে, এমনকি ঠাট্টার ছলেও বলে না; এবং সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সুউচ্চ শিখরে একটি ঘরের, যার রয়েছে উত্তম আচরণ।" [১০৭]

অন্যদিকে, আল্লাহ ঐসব ব্যক্তিদেরকে ঘৃণা করেন যারা একগুঁয়ে এবং ঝগড়াটে। আইশাহ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য ব্যক্তি হলো সেই ব্যক্তি, যে একগুঁয়ে এবং ঝগড়াটে।" [১০৮]

সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি এবং মতের অমিলের একটু-আধটু আশঙ্কা হতেই পারে। এ ধরনের মতবিরোধের কোনোটি হয়তো তাদের একজনকে অপর জন থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। অপরিণামদর্শী কোনো সিদ্ধান্তে তাদের দাম্পত্য-সম্পর্কে ফাটল দেখা দিতে পারে। এ কারণেই তাদের জন্য প্রথম উপদেশ হলো, এসব ক্ষেত্রে তারা যেন নিজেদের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করে ও ধৈর্য ধারণ করে। এই পদক্ষেপকেই আল্লাহ্ তা'আলা সমস্যা নিরসনের সর্বোত্তম পন্থা বলে ঘোষণা করেছেন:

২১৩৩)।

[১০৭] হাদীসটি আবু দাউদ এবং আদ-দিয়াউল মাক্বদিসি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি হাসান বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৪৬৪ এবং সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৭৩)।

[১০৮] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিম সংকলন করেছেন।

﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

« যদি কোনো স্ত্রীলোক নিজ স্বামীর অসদাচরণ ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে, তবে তারা পরস্পর কোনো সুমীমাংসায় উপনীত হলে তাদের উভয়ের কোনো অপরাধ নেই এবং মীমাংসাই কল্যাণকর; মানুষের মনের মধ্যে সংকীর্ণতা রয়েছে; তারপরও যদি তোমরা উত্তম কাজ করো ও সংযমী হও, তবে তোমরা যা করছ সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।[১০৯] »

স্ত্রীকে বিনোদন দেওয়া

স্ত্রীকে খেলার ছলে বিনোদন দেওয়া এবং ইসলামসম্মত পন্থায় বিভিন্নভাবে তাকে খুশি করা এবং তার মনে আনন্দের সৃষ্টি করার জন্য স্বামীকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সহধর্মিণীদের সাথে এমনটি করতেন। এই মর্মে 'আইশাহসহ অন্যান্য নবিজি-পত্নীদের থেকে বিস্তারিতভাবে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ এবং জাবির ইবনু 'উমাইর ؓ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আল্লাহকে স্মরণ করা হয় না এমন সবকিছুই বৃথা, নিরর্থক এবং বাতিল—তিনটি কাজ ছাড়া : যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বিনোদন দেয়, যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়, যখন (ধনুর্বিদ্যা চর্চার সময়) ব্যক্তি দুই খুঁটির মাঝখানে হাঁটে এবং অন্য ব্যক্তিকে সাঁতার শিক্ষা দেয়।"[১১০]

স্বামী যেহেতু পরিবারের প্রধান কর্তা, তাই স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তার আচরণ অবশ্যই হতে হবে ন্যায়সংগত এবং সুবিচারপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতা হবে পরিবার পরিচালনার ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতার পরিচায়ক। নিজের শারীরিক শক্তি ব্যবহার করে স্ত্রীকে নির্যাতন করা স্বামীর মোটেই উচিত নয়।

---

[১০৯] আন-নিসা, ৪:১২৮

[১১০] হাদীসটি আন-নাসা'ঈ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৪৫৩৪ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৩১৫)

অন্তরঙ্গতার গুরুত্ব

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে চমৎকার বোঝাপড়া এবং ভাবের উৎকৃষ্ট আদান-প্রদান বজায় রাখতে হবে। নিজেদের সুখ-দুঃখ, আবেগ, উৎকণ্ঠা পরস্পরের সাথে ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এতে তাদের মাঝে ভালোবাসা ও সম্প্রীতির বন্ধন অটুট থাকবে এবং স্বামী-স্ত্রীর 'সুখের নীড়' রচনার যে শর্ত তা প্রতিষ্ঠিত হবে।

যেদিন যে স্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপনের পালা থাকত সেদিন সেই স্ত্রীর ঘরে যাওয়ার পূর্বেই নবিজি ﷺ তাঁর অন্য সকল স্ত্রীদের সাথে দেখা করে তাদের সাথে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলাপ সেরে নিতেন। এটিই ছিল তাঁর প্রাত্যহিক রীতি।

পরস্পরের শারীরিক চাহিদা পূরণ করা

বিয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সতীত্বের সুরক্ষা। সাধারণভাবে এই ব্যাপারটি নারীদের থেকে পুরুষদের ক্ষেত্রেই বেশি প্রাসঙ্গিক; তবে নিশ্চিতভাবে তা নারীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ, স্বামীর কর্তব্য হলো, নিজের সাধ্যমতো তার স্ত্রীর জৈবিক চাহিদা মেটানো।

সে কারণেই পরস্পরের প্রতি তাদের বৈবাহিক কর্তব্য পূর্ণ করা স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই কর্তব্য। পরস্পরকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলামের পরিসীমার মধ্যে থেকেই পরস্পরকে সুখ ও আনন্দ দিতে সম্ভাব্য সবকিছু তাদের করা উচিত।

গাইরাহ্ বা ব্যক্তিত্ববোধ

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ-স্বরূপ তার প্রতি স্বামীর 'গাইরাহ্' থাকা উচিত। এ ক্ষেত্রে গাইরাহ্ হলো স্ত্রীর সার্বিক কল্যাণের ব্যাপারে স্বামীর গভীর উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা এবং তার জন্য ক্ষতিকর এমন সবকিছু—যেমন কারও অশুভ স্পর্শ, মন্দ কথা কিংবা কুনজর ইত্যাদি থেকে তাকে নিরাপদে রাখার মানসিক প্রস্তুতি।

তবে গাইরাহ্ যেন এমন মাত্রায় না পৌঁছায়, যা স্ত্রীর বিরক্তির উদ্রেক হয় বা অকারণে স্বামীর মনে স্ত্রীর ব্যাপারে সন্দেহ জাগে। আবার গাইরাহ্‌কে সামান্য ত্রুটিবিচ্যুতি খুঁজে বের করার মতলবে ব্যবহার করা যাবে না। জাবির ইবনু 'আতিক رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নিশ্চয়ই এক প্রকার গাইরাহ্ (আত্মসম্মানবোধ) আছে যা আল্লাহ ভালোবাসেন এবং অন্য এক প্রকার যা আল্লাহ ঘৃণা করেন। সেই গাইরাহ্ আল্লাহ ভালোবাসেন, যা হয় (বৈধ) সংশয়ের ভিত্তিতে, এবং সেই গাইরাহ্ আল্লাহ ঘৃণা করেন যা কোনো (বৈধ) সংশয় ছাড়াই করা হয়।"[১১১]

যে ব্যক্তির গাইরাহ্ নেই তাকে বলা হয় 'দাইয়ুস'। দাইয়ুস হলো সেই ব্যক্তি, নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে যার কোনো নিরাপত্তা বা সম্মানবোধ থাকে না।

সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকা

স্ত্রীকে দোষারোপ করার জন্য অযৌক্তিক সন্দেহ পোষণ বা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দোষ বের করা একেবারেই অনুচিত।

এ জন্যই নবিজি ﷺ পুরুষদেরকে হুট করে বাড়িতে ঢুকতে নিষেধ করেছেন। যেন সে পছন্দ করে না, এমন কোনো কাজ করা অবস্থায় সরাসরি স্ত্রীকে দেখে ফেলে। জাবির ﷛ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যখন তোমাদের কেউ দীর্ঘ সফর শেষে ফিরবে, সে যেন রাতের বেলা হঠাৎ করে পরিবারের কাছে না আসে।"[১১২]

স্ত্রীর গোপনীয়তা রক্ষা করা

স্ত্রীর গোপনীয় বিষয়কে প্রকাশ করা স্বামীর জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বিশেষ করে এমন গোপনীয় বিষয় যেগুলো সাধারণত স্বামী ছাড়া অন্য কোনো মানুষের জানার কথা নয়। যেমন: স্ত্রীর বিশেষ শারীরিক বা আবেগিক বৈশিষ্ট্য, শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হওয়ার সময় তার বিশেষ উদ্দীপন ও আচরণ, শরীরের কোনো অঙ্গের বিবরণ ইত্যাদি। আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রি ﷛ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে সে-ই, যে (পুরুষ) গোপনে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং সেও (নারী) গোপনে তার (স্বামীর) সাথে মিলিত হয় এবং সে (স্বামী) তার (স্ত্রীর) গোপনীয় বিষয়গুলো প্রকাশ করে দেয়।"[১১৩]

---

[১১১] হাদীসটি আহমাদ এবং আবু দাউদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি হাসান বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৯৯৯)।

[১১২] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[১১৩] হাদীসটি মুসলিম এবং আবু দাউদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

স্ত্রীর গোপনীয় বিষয়গুলোকে প্রকাশ করে দিলে স্ত্রীর মনে স্বামীর প্রতি অবিশ্বাস এবং ভয়ের জন্ম হয়। এই ধরনের আচরণ স্বামীর দাইয়্যুস প্রবণতার পরিচায়ক।

নারীর নাজুক প্রকৃতিকে বোঝা

শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিক দিয়েই নারীরা নাজুক প্রকৃতির হয়ে থাকে। বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারলে স্ত্রীর সাথে সদয় এবং কোমল আচরণ করা পুরুষের জন্য সহজ হয়ে যায়।

আনাস ﷺ বর্ণনা করেন, একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ সফরে ছিলেন এবং তাঁর সাথে স্ত্রীগণও ছিলেন। আনজাশাহ্ নামের এক আবিসিনীয় উটচালক নারীদের দলটিকে পরিচালনা করছিল। উটগুলোকে হাঁকানোর সময় সে গান গাইতো। এতে নারীদেরকে বহনকারী উটগুলো দ্রুত এগিয়ে যেত। তাই আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বললেন:

> “হে আন্‌জাশাহ্, তোমার জন্য অমঙ্গল। নাজুক পাত্রগুলোকে[১১৪] ধীরে ধীরে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও।”[১১৫]

আল-বুখারি, আল-কুরতুবি এবং আল-‘আসকালানিসহ[১১৬] অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, আল্লাহর রাসূল ﷺ এখানে দুটি বিষয় বুঝিয়েছেন:

- শারীরিক গঠন এবং প্রকৃতিগতভাবে নারীরা নাজুক এবং তাদেরকে নিয়ে দ্রুত উট চালনা করলে পড়ে গিয়ে বা অন্য কোনোভাবে তাদের অঘটন ঘটতে পারত।
- নারীরা প্রকৃতিগতভাবেই আবেগপ্রবণ হয়ে থাকে। ফলে খুব সহজেই গান এবং কাব্যের দ্বারা তাদের হৃদয় আলোড়িত হয় এবং তাদের জন্য ফিতনা বয়ে আনতে পারে।

পরস্পরের মনোভাব বুঝে মানিয়ে চলা

নারী হোক আর পুরুষ হোক, মাঝে মাঝে তারা রাগের বশবর্তী হতেই পারে। স্বামীর মেজাজ-মর্জি বুঝে স্ত্রীর চলা উচিত। বিশেষত যখন তারা বাইরে থেকে ঘরে ফেরে তখন কিছুতেই এমন কিছু করা বা বলা উচিত নয়, যা সে অপছন্দ করে। স্বামী

---

[১১৪] লক্ষণীয়, এই হাদীসের আলোকেই আমাদের বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে।

[১১৫] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[১১৬] ফাতহুল-বারীর বর্ণনা অনুযায়ী।

যদি রেগে যান তা হলে স্ত্রীর উচিত তর্ক এড়িয়ে সম্পূর্ণ চুপ থাকা—এমনকি স্বামী ভুল, এবং স্ত্রী সঠিক হলেও। পরবর্তী সময়ে যখন স্বামী খোশমেজাজে থাকে তখন যত্নের সাথে তার ভুল ধরিয়ে দিলে সে মেনে নেবে। একইভাবে স্বামীরও উচিত স্ত্রীর মন-মানসিকতা বুঝতে চেষ্টা করা। স্ত্রীর ক্ষণিকের রাগকে প্রতিশোধের উপলক্ষ বানিয়ে ফেলা মোটেই উচিত নয়; বরং বিষয়টিকে ঠাট্টার ছলে বা হালকা মেজাজে সামলে নেওয়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ। এ ক্ষেত্রে নবিজি ﷺ-এর দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। আইশাহ ﵂ বর্ণনা করেন, একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে বলেন:

> "নিশ্চয়ই আমি জানি কখন তুমি আমার প্রতি খুশি থাকো আর কখন রেগে থাকো—যখন তুমি আমার প্রতি খুশি থাকো, (কসম করার সময়) তুমি তখন বলো, 'না, মুহাম্মাদের প্রতিপালকের শপথ।' আর যখন তুমি আমার প্রতি রেগে থাকো, তখন তুমি বলো, 'না, ইব্‌রাহীমের প্রতিপালকের শপথ'।"
>
> তিনি প্রত্যুত্তরে বলেন, "নিশ্চয় তা-ই, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল, (রাগান্বিত অবস্থায়) আপনার নাম ছাড়া অন্য কিছু ত্যাগ করি না।" [১১৭]

নারীর প্রকৃতি বোঝা

স্ত্রী কোনো ভুল করলে, স্বামীর উচিত ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা দেখানো। এ ক্ষেত্রে স্বামীকে বুঝতে হবে, অনেক কিছুই আপাতদৃষ্টিতে ভুল বলে মনে হলেও সত্যিকার অর্থে তা ভুল না-ও হতে পারে। প্রকৃতিগত দিক থেকেই নারীরা পুরুষদের চেয়ে আলাদা। কাজেই পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রেও তারা পুরুষদের থেকে আলাদা হতেই পারে।

নবিজি ﷺ উল্লেখ করেছেন, নারীকে (হাওয়া বা ইভ্) সৃষ্টি করা হয়েছে মূলত পুরুষের (আদম) পাঁজরের হাড় থেকে। গঠনগত কারণেই পাঁজরের হাড় হয় বাঁকা। এ জন্যই নারীর মেজাজ কখনোই পুরুষের মেজাজের সাথে মিলবে না। কারণ, তাদের মাঝে আদি থেকেই একটা 'বাঁক' রয়ে গেছে।

নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ কথাও মিথ্যা নয়, পুরুষের প্রকৃতিতেও 'বাঁক' রয়েছে। অর্থাৎ পুরুষের কর্ম-পদক্ষেপ কখনোই নারীর কর্ম-পদক্ষেপের সাথে মিলবে না।

আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আদেশ করেছেন:

---

[১১৭] হাদীসটি আল-বুখারি, মুসলিম এবং আহ্‌মাদ সংকলন করেছেন।

> "নারীদের উত্তম যত্ন নাও; কারণ, নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে। আর পাঁজরের হাড়ের সবচেয়ে বাঁকা অংশ হলো উপরের প্রান্ত। যদি একে জোর করে সোজা করতে চাও, তা হলে তোমরা একে ভেঙে ফেলবে; আর যদি যেমন আছে তেমনি রেখে দাও, তা হলে তা বাঁকাই থেকে যাবে। সুতরাং, তোমরা নারীদের উত্তম যত্ন নাও।" [১১৮]

এই হাদীসে পাঁজরের হাড়ের ওপরের প্রান্ত বলতে সম্ভবত মাথাকে বুঝানো হয়েছে। মস্তিষ্কই হলো প্রধান মানবীয় ইন্দ্রিয়সমূহের (দর্শন এবং শ্রবণ) ধারক। মাথার অংশেই রয়েছে জিহ্বা যার মাধ্যমে কথা বলা হয়। আবার মাথা শরীরের এমন একটি অঙ্গ যেখানে চিন্তাপ্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে।

অর্থাৎ চিন্তা এবং পরিকল্পনা করার প্রয়োজন পড়ে এমন বিভিন্ন বিষয় সমাধা করার ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের পদক্ষেপ গ্রহণের পদ্ধতিগত পার্থক্যই হলো তাদের মাঝে প্রধান পার্থক্য। যেমন—তাদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যের কারণে তারা একই বিষয়কে ভিন্নভাবে দেখে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাদের আবেগিক প্রতিক্রিয়ার (হাসি, বাজে ভাষার ব্যবহার, মিথ্যা বলা ইত্যাদির মাধ্যমে) বহিঃপ্রকাশও ভিন্নভাবে ঘটে থাকে।

সামুরাহ্ ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে। যদি তুমি তা সোজা করার চেষ্টা করো, তুমি একে ভেঙে ফেলবে। অতএব তার প্রতি কোমল হও। এতে তুমি তার সাথে আনন্দে জীবন যাপন করবে।" [১১৯]

এই হাদীসে নবিজি ﷺ নারীর কোনো স্বভাবসুলভ আচরণকে পরিবর্তনের জন্য তাকে বাধ্য করাকে পাঁজরের হাড় ভেঙে ফেলার সাথে তুলনা করেছেন। আর পাঁজরের হাড় ভেঙে ফেলার অর্থ হলো 'তালাক'। আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পাঁজরের হাড় থেকে। তোমার ইচ্ছেমতো সে সোজা হবে না। যদি তুমি তাকে উপভোগ করতে চাও, তা হলে তোমাকে তার বাঁকা ভাব নিয়েই উপভোগ

---

[১১৮] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিম সংকলন করেছেন।

[১১৯] হাদীসটি আহমাদ, ইবনু হিব্বান এবং আল-হাকিম সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ১৯৪৪)।

করতে হবে। কিন্তু তুমি যদি তাকে সোজা করার চেষ্টা করো, তুমি তাকে ভেঙে ফেলবে; আর তাকে ভেঙে ফেলার মানে হলো তাকে তালাক দেওয়া।"[১২০]

স্ত্রীর ভালো দিকটিই বিবেচনা করা

পাপের পর্যায়ে না পড়লে স্ত্রীর ভুলত্রুটি উপেক্ষা করে তার ভালো গুণাবলির দিকটাই বিবেচনা করে তাকে মূল্যায়ন করা উচিত। নবিজি ﷺ ইঙ্গিত করেছেন, নারীর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো পরিবর্তন করা কঠিন, এমনকি অসম্ভব।

পুরুষ যেমন সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত হতে পারে না, নারীর ক্ষেত্রেও তা-ই। দাম্পত্য জীবনকে উপভোগ্য করে তুলতে হলে স্বামীকে অবশ্যই স্ত্রীর কিছু অপছন্দনীয় কাজকর্মের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে সেগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে হবে। সেই সাথে, স্ত্রীর যে সমস্ত কাজকর্ম স্বামী পছন্দ করে সেগুলোকে স্বীকৃতি জানাতে হবে। নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রীর ভালো গুণগুলো তার ছোটখাটো ত্রুটি-বিচ্যুতিকে আড়াল করে দেবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

« যদি তোমরা তাদেরকে অপছন্দ করো, তা হলে হতে পারে তোমরা হয়তো এমন কিছু অপছন্দ করছ যার মাঝে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।[১২১] »

আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

"কোনো বিশ্বাসী পুরুষ যেন কোনো বিশ্বাসী নারীকে ঘৃণা না করে; তার একটি খারাপ গুণ সে অপছন্দ করলেও তার অন্যান্য গুণগুলো তাকে সন্তুষ্ট করবে।"[১২২]

ভালো দিকগুলোকে উপেক্ষা করে শুধু খারাপ দিকগুলো নিয়ে মেতে থাকলে তা নিশ্চিতভাবে দাম্পত্য-জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। পুরুষরা যদি এই বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করে, তা হলে দাম্পত্য-জীবন হবে দুর্দশা আর বিষাদে আচ্ছন্ন যা বিবাহ-বিচ্ছেদের পথকে সুগম করবে।

---

[১২০] হাদীসটি মুসলিম এবং আত-তিরমিযি সংকলন করেছেন।

[১২১] আন-নিসা, ৪:১৯।

[১২২] হাদীসটি মুসলিম এবং আহমাদ সংকলন করেছেন।

পারস্পরিক সহযোগিতা ও তার সীমারেখা

স্বামী-স্ত্রী সুদীর্ঘ একটি সময়ের জন্য পরস্পরের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জীবনসাথি। কাজেই নিজেদের অংশীদারিত্বপূর্ণ সম্পর্ককে সার্থক করার জন্য পরস্পরকে সহযোগিতা করতে গিয়ে তাদের সাধ্যমতো সবকিছুই করতে হবে। এর মধ্যে শারীরিক, আর্থিক এবং মানসিকসহ সব ধরনের সহযোগিতাই অন্তর্ভুক্ত।

যখন স্বামী বা স্ত্রীর কোনো একজন শারী'আহ-সম্মত কোনো কাজ করবে, তখন অন্য জনের জন্য মুস্তাহাব হলো তাকে সেই কাজ করার জন্য নিজের সাধ্যমতো সাহায্য করা। আবার তাদের দুজনের কোনো একজন যখন শারীয়াহ্‌র কোনো ফরয হুকুম পালন করবে, তখন অন্য জনের অপরিহার্য কর্তব্য হলো তাকে সেই হুকুম পালনের জন্য নিজের সাধ্যমতো সাহায্য করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

« সৎকর্ম ও তাক্‌ওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা করো। মন্দ কর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা কোরো না। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর।[১২৩] »

একইভাবে, উল্লিখিত আয়াত থেকে সিদ্ধান্ত হলো, যখন স্বামী বা স্ত্রীর কোনো একজন মাক্‌রুহ (অপছন্দনীয়) কোনো কাজ করবে, তখন অন্য জনের জন্য তাকে সেই কাজ করতে সহযোগিতা করাও হলো মাক্‌রুহ। আবার তাদের দুজনের কোনো একজন যখন শারীয়াহ্‌তে নিষিদ্ধ কোনো কাজ করবে, তখন অন্য জনেরও তাকে সেই কাজ করতে সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ। আলী ﷛ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আল্লাহর অবাধ্যতা করে মানুষের আনুগত্য করা যাবে না। আনুগত্য হবে কেবল বৈধ বিষয়ে।"[১২৪]

---

[১২৩] আল-মায়েদা, ৫:২

[১২৪] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিম সংকলন করেছেন। ইমরান ইবনু হুসাইন ﷛ থেকে অনুরূপ একটি হাদীস আহ্‌মাদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন যেটিকে আল-আলবানি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৭৯, ১৮০)।

অনেক সময় ইবাদাত-কর্মে মানুষের দুর্বলতা এবং মনোযোগের অভাব দেখা দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে সদয় সাহায্য এবং সহযোগিতা ব্যক্তির মনে বাড়তি আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক দৃঢ়তার সঞ্চার করবে। নিজের স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্য আর কে এই সহযোগিতা করার জন্য বেশি উপযুক্ত? তাহাজ্জুদের সালাতের ব্যাপারে নবিজি ﷺ-এর দেওয়া দৃষ্টান্তই এ ক্ষেত্রে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। আবু হুরায়রা رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আল্লাহ করুণা করুন ওই ব্যক্তির ওপর, যে রাতে ওঠে সালাত আদায় করে এবং তার স্ত্রীকে জাগিয়ে দেয়; স্ত্রী যদি ওঠতে না চায় তা হলে তার মুখমণ্ডলে হালকা পানির ঝাপটা দেয়। আল্লাহ করুণা করুন ওই নারীর প্রতি, যে রাতে ওঠে সালাত আদায় করে এবং তার স্বামীকে জাগিয়ে দেয়; স্বামী যদি উঠতে না চায় তা হলে তার মুখমণ্ডলে পানির ঝাপটা দেয়।"[১২৫]

এই হাদীসে চিত্রিত স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলার যে মধুময় এবং মনোহর কায়দা তা লক্ষণীয়। ঘুমন্ত ব্যক্তিকে হঠাৎ করে ঝাঁকিয়ে তুললে কিংবা গায়ে এক মগ কনকনে ঠান্ডা পানি ঢেলে দিলে সে নিশ্চয়ই হতভম্ব হয়ে পড়বে। ফলে বিরক্ত হয়ে তার ডাকে সাড়া দিতে চাইবে না, কিংবা অপ্রীতিকর আচরণ করবে। কিন্তু সুন্দরভাবে একটু আদর-সোহাগ করে ডেকে তুললে স্বাভাবিকভাবেই সে ডাকে সাড়া দেবে।

পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করা

এই অধ্যায়ের প্রথম দিকে আমরা পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। সেসব দায়িত্বের একটি হলো, পরিবারকে ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। আর সেই ধ্বংস থেকে রক্ষা করার প্রথম ও প্রধান কাজ হলো—পরিবারকে ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে পরিচালিত করার মাধ্যমে শয়তান ও তার দোসরদের কুচক্র থেকে পরিবারের সদস্যদেরকে রক্ষা করা। অতএব সন্তানদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করার জন্য এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর জন্য স্বামী-স্ত্রীরপরস্পরকে অবশ্যই সহযোগিতা করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

---

[১২৫] হাদীসটি আহমাদ এবং আবু দাউদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি হাসান বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৪৬৪ এবং সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৭৩)।

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾

« হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।[১২৬] »

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সৎকাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করতে হবে। এই কাজ তারা প্রথমে নিজেদের মধ্যে এবং তারপর অন্য মানুষের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করবে।

সঙ্গ পরিত্যাগের বিধান

এমন অনেক পরিস্থিতি আছে যেগুলোতে অপরাধের যথোচিত শাস্তি হিসেবে অন্য কারও সঙ্গ পরিত্যাগ করা বৈধ। উদাহরণস্বরূপ, অবাধ্য স্ত্রীর বিছানা পরিত্যাগ করার ব্যাপারে যে অনুমতি আছে, তা নিয়ে পরবর্তী সময়ে আলোচনা করব। আমরা সেই সকল দৃষ্টান্তগুলোও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখব, যেখানে নবিজি ﷺ তাঁর কয়েক জন বা সকল স্ত্রীদের সঙ্গ বর্জন করেছিলেন। তবে তখনই কেবল একজন মুসলিমের সঙ্গ পরিত্যাগ করা উচিত, যখন তার সাথে সমঝোতার সবগুলো সহজ পন্থা ব্যর্থ হয়ে যায়। আর এটি একটি অস্থায়ী পদক্ষেপ হিসেবে মাথায় রেখেই এমনটি করতে হবে। লম্বা সময়ের জন্য বা স্থায়ীভাবে সম্পর্ক ছিন্ন রাখলে তাতে পারস্পরিক ঘৃণার জন্ম হয় এবং অন্তর কঠিন[১২৭] হয়ে যায়। অতএব এমনটি করা বৈধ নয়। আবু হুরায়রা, ইবনু 'উমার, আবু আইয়্যুব এবং অন্যান্য সাহাবাগণ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "কোনো মুসলিমের জন্য তার ভাইয়ের সাথে তিনদিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখা বৈধ নয়।"[১২৮]

তবে অবাধ্য স্ত্রীর সংশোধনের জন্য তার সঙ্গ পরিত্যাগের বৈধতা রয়েছে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর সাথে তার স্বামী কীরূপ আচরণ করবে, সে বিষয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে চারটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন:

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

[১২৬] আত-তাহরিম, ৬৬:৬।

[১২৭] যেমন প্রচলিত একটি প্রবাদ হলো, 'চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল হয়।'

[১২৮] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিম সংকলন করেছেন।

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾

« পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাজতকারী ওই বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাজত করেছেন। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতা আশঙ্কা করো তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ করো এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার করো। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে, তা হলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অনুসন্ধান কোরো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত মহান। আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো, তা হলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায়, তা হলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সম্যক অবগত।[১২৯] »

প্রথম পদক্ষেপ: সদুপদেশ দেওয়া। তাকে তার কৃত অপরাধের ব্যাপারে বুঝানো এবং এর মাধ্যমে যে সে আল্লাহর কাছে পাপী হচ্ছে তা তাকে অনুধাবন করাতে চেষ্টা করা। মনে রাখতে হবে—এটা উপদেশ হতে হবে, তর্ক নয়। আমরা যদি বাইরে কোনো ব্যক্তিকে দীনের দাওয়াত দিতে যাই, তা হলে যেভাবে বিনয় ও প্রজ্ঞার সাথে তাকে দীনের কথা বুঝিয়ে বলি, তেমনিভাবে স্ত্রীকেও বুঝাতে হবে। সে স্ত্রী হলেও মৌলিকভাবে সে একজন মানুষ এবং কোনো কথার প্রভাব তার অন্তরে পড়া বা না পড়ার ব্যাপারে সে অন্য সাধারণ পাঁচজন মানুষের মতোই; বরং অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী উপদেশ ও নাসীহাহ শুনতে আগ্রহী থাকে না। তাই এ ক্ষেত্রে যথাযথ সাবধানতা ও প্রজ্ঞার সাথে তাকে উপদেশ দিতে হবে।

দ্বিতীয় পদক্ষেপ: বিছানা আলাদা করা। এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যে—বিছানা আলাদা করা মানে স্ত্রীকে সম্পূর্ণ বর্জন করা নয়। বিশেষ করে অন্য কেউ যেন বিষয়টি আঁচ করতে না পারে সে ব্যাপারে খুব সতর্ক

---

[১২৯] আন-নিসা, ৪:৩৪-৩৫।

থাকতে হবে। বিছানা আলাদা করার মূল বিষয় হলো শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন না করা। সম্ভব হলে একটু দূরত্ব বজায় রেখে রাত্রি যাপন করা। কিন্তু অন্যদের কাছে যদি ব্যাপারটা জানাজানি হয় তা হলে তা স্ত্রীর জন্য চরম অপমানজনক হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে সংশোধনের পথে না গিয়ে সে আরও বক্রতার দিকে যেতে পারে। এমনিতেই সত্যিকার আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একজন স্ত্রীর জন্য স্বামীর বিছানা বর্জন চূড়ান্ত পর্যায়ের মানসিক কষ্টের কারণ,। তার মধ্যে যদি সংশোধনের মানসিকতা থাকে তা হলে এতেই সে নিজেকে সংশোধন করে নেবে।

তৃতীয় পদক্ষেপ: প্রহার করা। তবে মনে রাখতে হবে—এটা অন্যান্য ফৌজদারি অপরাধের কারণে প্রহার করে যে শারীরিক শাস্তি দেওয়া হয় তেমন প্রহার নয়; বরং এটা হলো স্ত্রীর জন্য একটি চূড়ান্ত সংকেত। অর্থাৎ এতেও যদি কাজ না হয় তা হলে হয়তো বিচ্ছেদ ছাড়া কোনো পথ থাকবে না। সেহেতু এ ক্ষেত্রে শারীরিকভাবে আহত করার মতো কোনো প্রহার করা বৈধ নয়; এবং এটা করে আসলে কোনো লাভও হবে না; বরং একেবারেই মৃদুপ্রহার, যাতে তার শরীরে কোনো ক্ষতচিহ্ন বা দাগ না পড়ে।

বাসর রাত

বাসর রাতে নববিবাহিত দম্পতিকে নিজেদের একান্তে ছেড়ে দেওয়ার পূর্বে স্বামী-স্ত্রীর মিলন, তাদের পারস্পরিক দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইসলামের দিকনির্দেশনা কী, সে সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্নে বিধৃত হলো:

নববধূর প্রতি কোমল আচরণ

নবদম্পতির প্রথম সাক্ষাতের প্রথম রাতে নববধূর সাথে স্বামীর আচরণ হবে অত্যন্ত কোমল ও মধুময়। বিশেষ করে সে যদি কুমারী হয়, তবে স্বামীকে বুঝতে হবে আজকের এই রাতে নববধূটির জীবনে সূচিত হতে যাচ্ছে সম্পূর্ণ নতুন এক অধ্যায়ের। ফলে সে বিচলিত বোধ করতে পারে, স্বামীকে সহযোগিতা করতে কিছুটা আড়ষ্ট হতে পারে। কাজেই পাশবিক প্রবৃত্তি নিয়ে তার ওপর চড়াও হওয়া যাবে না কিছুতেই। যদি প্রথম রাতেই তাকে পুরোপুরি প্রস্তুত মনে না হয়, তা হলে স্বামীর উচিত তার জড়তা কাটানোর জন্য চেষ্টা করা এবং প্রয়োজনে চূড়ান্ত মিলনের জন্য একাধিক দিন পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকা।

আইশাহ ﵂-এর সাথে প্রথম রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আচরণ ছিল অত্যন্ত কোমল ও সংযত। সে রাতে রাসূল ﷺ তাকে কিছু দুধ পান করতে দেন, তার বান্ধবীদের কিছুক্ষণ তার সাথে থাকার সুযোগ দেন এবং তাদের সাথে ঠাট্টার ছলে কথা বলেন। এর সবকিছুই ছিল আইশাহ ﵂-এর মানসিক উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য।

আসমা' বিন্‌ত ইয়াজিদ ইবনু আস-সাকান ﵂[১৩০] বর্ণনা করেন,

> তিনি আইশাহ ﵂-কে নবিজি ﷺ-এর জন্য সাজালেন এবং তাঁকে ভেতরে আসার জন্য আহ্বান করলেন। তিনি ভেতরে এসে তার পাশে বসলেন। তাঁকে বড় একটি পেয়ালায়

[১৩০] তিনি ছিলেন মু'আয ইবনু জাবালের কাজিন: আনসার মহিলাদের একজন, যিনি বাই'আতুর রিদ্‌ওয়া-এর সময় নবিজি ﷺ-এর কাছে বাই'আত গ্রহণ করেন।

করে দুধ দেওয়া হলো। তিনি এর কিছুটা পান করলেন এবং বাকিটা 'আইশাহকে দিলেন। এতে তিনি লজ্জায় মাথা নিচু করলেন। আসমা' তাকে এই বলে বকুনি দিলেন, 'আল্লাহর রাসূলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কোরো না।' এতে তিনি পেয়ালাটি নিয়ে তা থেকে কিছুটা পান করলেন। এরপর রাসূল ﷺ তাকে বললেন, "তোমার বান্ধবীকেও দাও।" আসমা' ؓ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, প্রথমে আপনি এটা নিন এবং তা থেকে পান করুন, তারপর তা নিজ হাতে আমাকে দিন।' তিনি তা নিলেন, তা থেকে কিছুটা পান করে আসমা'কে দিলেন। আসমা' বসে পান করলেন। নিজের ঠোঁট দুটো রাসূল ﷺ যে স্থানে[১৩১] রেখে পান করেছিলেন সেখানে রেখে পান করলেন। এরপর রাসূল ﷺ উপস্থিত মেয়েদেরকে উদ্দেশ্য করে আসমা'কে বললেন, "তোমার বান্ধবীদের দাও।" তারা বলল, 'এতে আমাদের ইচ্ছে নেই।' তিনি বললেন:

"ক্ষুধাকে মিথ্যার সাথে এক করে দিয়ো না।"[১৩২]

এক সাথে দুই রাকা'আত সালাত

স্বামী ঈমাম হয়ে নববিবাহিত দম্পতি একসাথে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করা মুস্তাহাব। এর মাধ্যমে যে শুভ লক্ষণের সূচনা হয় তা এই, তাদের দাম্পত্য-জীবনের প্রথম রাত থেকেই তারা আল্লাহর আনুগত্যের মধ্য দিয়ে পরস্পর মিলিত হলো। একসাথে দুই রাকা'আত সালাত আদায় করার পর স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হলো তাদের উভয়ের কল্যাণের জন্য ও ভবিষ্যৎ দিনগুলোর জন্য আল্লাহর রহমত বরকত কামনা করে আল্লাহর নিকট দু'আ করা।

চুলের অগ্রভাগ ধরে দু'আ করা

এটি একটি বিশেষ সুন্নাহ-পদ্ধতি যার মাধ্যমে এই বিশেষ সময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ কামনা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমর ؓ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

"যখন তোমাদের কেউ স্ত্রী, কাজের লোক কিংবা সওয়ারের জন্তু লাভ করবে, সে (মৃদুভাবে) চুলের অগ্রভাগ ধরে আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ কামনা করবে, এবং বলবে—'হে আল্লাহ, তার মধ্যে কল্যাণ দান করো; হে আল্লাহ, আমি তার কল্যাণ থেকে

---

[১৩১] আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর স্পর্শে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে।

[১৩২] হাদীসটি আহমাদ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (আদাবুয্ যিফাফ, পৃষ্ঠা ৯২)।

> এবং যে কল্যাণের ওপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ তা থেকে কল্যাণ কামনা করছি; এবং তোমার কাছে আমি তার অকল্যাণ থেকে এবং যে অকল্যাণের ওপর তাকে তুমি সৃষ্টি করেছ তা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি'। এবং এটি যদি কোনো উট হয় তা হলে এর কুঁজের চূড়া ধরে দু'আ পাঠ করতে হবে।" [১৩৩]

বাসর রাতের পরের দিন

বাসর রাতের পরের দিন সকালে স্বামীর জন্য মুস্তাহাব হলো পরিবারের লোকজন এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা করা, তাদেরকে সালাম জানানো, তাদের জন্য দু'আ করা। আনাস ﷺ বর্ণনা করেন:

> "যায়নবের সাথে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বিয়ের পরের দিন সকালে তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে দেখা করেন এবং তাদের সাথে সালাম এবং দু'আ বিনিময় করেন। বিয়ের পরের দিন সকালে এমনটি করাই ছিল তাঁর রীতি।" [১৩৪]

হানিমুন বা মধুচন্দ্রিমা

বিয়ের ঠিক পর পরই 'মধুচন্দ্রিমা' পালনের জন্য ভ্রমণে কোথাও বের হওয়া নবদম্পতিদের মাঝে একটি অতি প্রচলিত রীতি হয়ে গেছে। আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী তারা দেশে কিংবা বিদেশে নয়তো পর্যটন শিল্পের জন্য বিখ্যাত কোনো স্থানে ভ্রমণ করে থাকে।

কোনো সন্দেহ নেই, এই মধুচন্দ্রিমা হলো অমুসলিম সমাজের অন্যতম একটি প্রথা যা অনুকরণ করার জন্য আজ মুসলিমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। মূলত নিজের পাপের বোঝাকে আরও ভারী করার উপলক্ষ এটি। এ সময় যা হয় তা হলো—অমুসলিমদের সাথে মেলামেশা, গান-বাজনায় মত্ত হওয়া, মদ পরিবেশন করা হয় এমন রেস্তোরাঁয় খাওয়া, সমুদ্র সৈকতসহ অন্যান্য আকর্ষণীয় স্থানে যাওয়া যেখানে লোকজন আপত্তিকর পোশাক পরে থাকে ইত্যাদি।

বিয়ে উপলক্ষে কাজ থেকে কয়েক দিনের ছুটি পাওয়া গেলে নববিবাহিত দম্পতির উচিত হবে না এই সময়টুকু আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে কাটানো। এই সুবর্ণ

---

[১৩৩] হাদীসটি সম্মিলিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং আল-বুখারি, ইবনু আবি শাইবাহসহ অন্যান্যরা তা সংকলন করেছেন।

[১৩৪] হাদীসটি আন-নাসা'ঈ এবং ইবনু সা'আদ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে বলে মত দিয়েছেন (আদাবুয যিফাফ, পৃষ্ঠা ১৩৮)।

সময়টা তারা 'উমরাহ করে কাজে লাগাতে পারে। কিংবা আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের লোকজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে সম্পর্কের বন্ধনকে সুদৃঢ় করার পাশাপাশি তাদেরকে ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে আহ্বান করতে পারে।

তবে হ্যাঁ, ভ্রমণের সাথে যদি কোনো গুনাহ কিংবা কোনো অমুসলিমদের রীতিনীতির সম্পর্ক না থাকে তা হলে স্বামী-স্ত্রী দুজনে একান্তে কিছু সময় কাটানোর জন্য বাইরে যেতে পারে; তাতে কোনো অসুবিধা নেই—সম্পাদক।

দৈহিক মিলন

মহান আল্লাহর অসীম করুণা ও দয়া তাঁর সৃষ্টির প্রতি—বিশেষত তাঁর শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম সৃষ্টি মানুষের প্রতি। মানুষের জীবনকে আনন্দময় করার জন্য তিনি প্রকৃতির মধ্যে যে আয়োজন করেছেন তার কোনো তুলনা নেই—যেমন তাঁর নিজের কোনো তুলনা নেই। সৃষ্টিজগতে এমন অনেক জিনিস আছে যার দৃশ্যমান কিংবা বস্তুগত তেমন কোনো উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা সাদা চোখে উপলব্ধি করা যায় না; কিন্তু বাস্তবে জিনিসগুলো অমূল্য।

এই যে সারি সারি পাখির ঝাঁক ডানা মেলে আকাশে উড়ে যায়, এই যে দীঘির জলে ভেসে থাকা পানকৌড়িটি, ওই যে বাগানে শত শত ফুলের মেলা, রঙের ডালা—কী হতো এগুলো না থাকলে?

মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান যদি তিনি মাত্র দুপ্রকারের মাছ আর তিন প্রকারের শাক-সবজির মধ্যে দিয়ে দিতেন তবে কী সমস্যা হতো! কী হতো এত রঙ না বানিয়ে যদি পৃথিবীকে সাদা-কালো বানাতেন?

তিনি রহমানুর রাহীম, আহসানুল খালিকীন। তাঁর প্রিয় সৃষ্টি, তাঁর বান্দা মানুষের জন্যই এই পৃথিবীর সকল আয়োজন করে বলেছেন:

"তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি এই পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তা সব তোমাদের জন্য বানিয়েছেন।"

তিনি আদাম (আ.)-কে মাটি থেকে বানিয়েছেন। চাইলে সকল মানুষকেও তেমনিভাবে কিংবা অন্য কোনোভাবে সৃষ্টি করতে পারতেন। চাইলে আকাশ থেকে বৃষ্টির সাথে মানব শিশু ফেলতে পারতেন, চাইলে গাছের মতো মাটি থকে মানুষ গজিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি; তিনি এই সৃষ্টি প্রক্রিয়াটিকে এক চরম ও পরম আনন্দের উপলক্ষ বানিয়েছেন মানুষের জন্য। এর মধ্যে তিনি মানুষের মনো-দৈহিক প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছেন। সৃষ্টি জগতের মাঝে একমাত্র মানুষই কেবল

সন্তান জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া আনন্দ উপভোগের জন্য শারীরিক সংসর্গে লিপ্ত হয়। পক্ষান্তরে অন্য প্রাণীরা সাধারণত বাচ্চা উৎপাদনের সময়েই এ প্রজনন কাজে লিপ্ত হয়। তাদের জন্য শারীরিক মিলনের মধ্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে না।

আল্লাহ চাইলে মানুষের জন্যও প্রজননের আনন্দহীন অন্য কোনো পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। যুগে যুগে আল্লাহর এই নিয়ামাতের চরম অপব্যবহার করেছে মানুষ। বর্তমান যুগ যেন এ ক্ষেত্রে তার চূড়া ছুঁয়েছে।

পশ্চিমা ভোগবাদী, বস্তুবাদী, সেক্যুলার সভ্যতা আজ নারী-পুরুষের সম্পর্ককে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে, যেন এটিই মানব-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদেশ্য ও পরম প্রাপ্তি। মানুষের এই জৈবিক তাড়নাকে সব সময় কৃত্রিমভাবে উত্তেজিত করে রাখার জন্য যাবতীয় আয়োজন সম্পন্ন করেছে। অশ্লীলতা, নাটক, সিনেমা, বিজ্ঞাপনে নারীদেহের ব্যাপক প্রদর্শনীর মাধ্যমে তারা এ কাজ করে যখন তৃপ্ত হতে পারেনি, তখন নীল ছবির ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছে। অথচ এটি জীবনের খুব সামান্য সময়ের জন্য সংগোপনে সম্পন্ন করার মতো প্রয়োজনীয় একটি বিষয়।

জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে প্রয়োজনের সময় এ কাজ সম্পাদনের জ্ঞান মহান আল্লাহ মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই দিয়ে দিয়েছেন। এটা কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না। একটি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করার পর তার মুখে যখন মায়ের দুধের বোঁটা দেওয়া হয়, সে তখন সর্বশক্তি দিয়ে টানে তার খাদ্য আহরণের জন্য। কিন্তু এই শিক্ষার জন্য শিশুটিকে কোনো ক্লাস করতে হয়নি। এটা যেমন তার প্রকৃতিগত, তেমনি জৈবিক মিলনের ব্যাপারটিও একই রকম প্রকৃতিগত। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা জানা যায় না, কোনো ছেলেমেয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর বিয়ে হলে সে ওই কাজ কীভাবে করতে হয় তা বুঝে উঠতে পারেনি। তাই জৈবিক শিক্ষার নামে কোনো ক্লাস চালু করার প্রয়োজন নেই। এ ধরনের ক্লাস কেবল অশ্লীলতার দিকের যাত্রাকেই আরও ত্বরান্বিত করবে। তাই এখানে আমরা শারীরিক মিলনকে কেবল মানবিক, পরিশীলিত, সুখময় ও উদ্দেশ্যপূর্ণ করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ইসলামী দিকনির্দেশনাগুলো তুলে ধরব ইনশা আল্লাহ।

উদ্দেশ্য বিশুদ্ধ করা

যেকোনো ভালো কাজের ক্ষেত্রে প্রথমে নিয়্যাত বা উদ্দেশ্যকে বিশুদ্ধ করে নেওয়া উচিত। একজন মুসলিমের কাছে শারীরিক মিলনও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রথমত এর

উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে এবং স্ত্রীকে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার থেকে মুক্ত রেখে পবিত্র জীবন যাপন করা। দ্বিতীয়ত সন্তান জন্মদান করে পৃথিবীতে আল্লাহর বান্দাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা—যারা আল্লাহর ইবাদাত করবে। যদি নিয়্যাত বিশুদ্ধ হয় তা হলে নিজের চাহিদা পূরণ ও সুখ উপভোগ করার পাশাপাশি এর মাধ্যমে সাওয়াবও লাভ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> "তোমাদের (বৈধ) শারীরিক মিলনের মধ্যেও সাওয়াব আছে।" সাহাবীরা বলেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! কেউ তার নিজের জৈবিক চাহিদা পূরণ করছে, এর মধ্যে আবার সে সাওয়াবও পাবে?' তিনি বলেন, "কেন হবে না! সে যদি অন্যায়ভাবে এ কাজ করত তা হলে কি তার গুনাহ হতো না?" [১৩৫]

সুগন্ধি ব্যবহার

রুচিশীলতার পরিচয় ও ভালো লাগার একটি উপাদান হলো সুঘ্রাণ। যেকোনো মানুষই সুঘ্রাণ পছন্দ করে, আর দুর্গন্ধ অপছন্দ করে। আতরের দোকানের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় লম্বা দম নিয়ে ঘ্রাণ নেয়, আর ডাস্টবিনের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় নাকে রুমাল চাপে। গায়ের ঘ্রাণ যেমন মানুষের রুচিশীলতা প্রকাশ করে, তেমনি অন্যকে আকর্ষিতও করে। সুগন্ধিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে দুনিয়ার হাতে গোনা প্রিয়তম ক'টি জিনিসের একটি বলেছেন। আইশাহ رضي الله عنها বলেন,

> "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম, তারপর তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন।" [১৩৬]

তাই স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ঘনিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে প্রত্যেকের নিশ্চিত করা উচিত, তার শরীর থেকে কোনো দুর্গন্ধ আসছে কি না। যদি কারও বগলে কিংবা গায়ের ঘামে দুর্গন্ধ থাকে তা হলে তা দূর করে নেওয়া প্রয়োজন। হালাল যেকোনো সুগন্ধি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সঙ্গীর রুচির দিকে খেয়াল রাখতে হবে। নির্দিষ্ট কোনো ঘ্রাণ যদি স্বামী বা স্ত্রীর কাছে অপ্রিয় বা অসহনীয় হয় তা হলে তা বর্জন করাই শ্রেয়।

মুখের দুর্গন্ধও একটি সমস্যা। যা অনেক সময় কোনো রোগের কারণে হতে পারে, আবার অনেক সময় মুখ ও দাঁতের যত্ন না নেওয়ার কারণেও হতে পারে। রোগ হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন; আর নিয়মিত মুখ ও দাঁতের যত্ন নিন; প্রয়োজনে

---

[১৩৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২০

[১৩৬] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

মাউথ-ওয়াশ ব্যবহার করুন—বিশেষত বিছানায় যাওয়ার পূর্বে। মুখে সুঘ্রাণ আনে এমন কোনো জিনিস মুখে রাখতে পারেন, যেমন: এলাচি, দারুচিনি কিংবা মেন্থল জাতীয় কিছু।

সহবাসের পূর্বক্ষণ

এসেই ক্ষুধার্তের মতো ঝাঁপিয়ে মোটেই উচিত নয়; এটা কোনো রুচিশীলতার পরিচায়কও নয়। ইসলামে শারীরিক সংগমের পূর্বে অন্তরঙ্গতার মাধ্যমে স্ত্রীকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রস্তুতিহীন আকস্মিক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন অনেক সময় নারীর জন্য আনন্দের পরিবর্তে কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। তাই এ ধরনের কাজকে ইসলামে পশুর মতো কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ইমাম দাইলামী আনাস বিন মালিকের সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> "কেউ যেন পশুর মতো তার স্ত্রী হতে নিজের যৌন-চাহিদাকে পূরণ না করে, বরং তাদের মধ্যে চুম্বন এবং খোশগল্পের মাধ্যমে তাকে প্রস্তুত করে নেওয়া উচিত।" [১৩৭]

ইমাম ইবনুল কায়্যিম তার 'তিব্বে নববী' নামক গ্রন্থে শৃঙ্গার করার আগে সংগম করতে নিষেধ করেছেন। প্রখ্যাত বিদ্বান আল মুনাব্বিহ বলেন:

> "শারীরিক সম্পর্কের পূর্বে শৃঙ্গার এবং আবেগপূর্ণ চুম্বন করা সুন্নাহ মুওয়াক্কাদাহ এবং এর অন্যথা করা মাকরূহ।" [১৩৮]

অতএব ধৈর্যশীল হোন। কিছুক্ষণ খোশ মেজাজে গল্প করুন, হাসি-আনন্দ করুন, প্রেম-ভালোবাসাপূর্ণ কথা বলুন। তারপর কিছুক্ষণ পরস্পরকে আদর-সোহাগ করুন। শরীরের যে সকল স্থানে স্পর্শ করলে শরীর উত্তেজিত হয় সেসব স্থানে স্পর্শ করুন, চুম্বন করুন। এরপরই চূড়ান্তভাবে ঘনিষ্ঠতার দিকে যান।

সহবাসের দু'আ

আমাদের দৃশ্যমান জগতের বাইরেও অনেক কিছু রয়েছে। শয়তান মানুষের সামনে-পেছনে, ডানে-বামে সব সময় থাকে। কোনো কাজ করার সময় যখন আমরা আল্লাহর নাম স্মরণ করি না তখন শয়তান আমাদের সাথে সেই কাজে অংশগ্রহণ করে। তাই

---

[১৩৭] দাইলামীর মুসনাদ আল-ফিরদাউস, ২/৫৫

[১৩৮] ফাইজ আল-ক্বাদির, ৫/১১৫, দ্রষ্টব্য: হাদীস নং ৬৫৩৬

সংগম শুরুর পূর্বে আল্লাহর নাম নেওয়া এবং শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া জরুরি। ইব্‌ন আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "তোমাদের মধ্যে কেউ যখন স্ত্রী সহবাস করে, তখন সে যেন বলে:
>
> 'আল্লাহর নামে শুরু করছি। হে আল্লাহ, আমাকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং আমাকে তুমি যা দান করবে তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখো।'
>
> তা হলে তাদের দুজনের মাঝে এ মিলনের দ্বারা যদি সন্তান দেওয়া হয় তখন শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।[১৩৯]"

সহবাসের বৈচিত্র্যময় আসন

অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো শারীরিক মিলন নিয়েও মানুষের মাঝে দু'মুখী প্রান্তিকতা দেখা যায়। এক শ্রেণির মানুষ সকল বিধি-নিষেধ দুপায়ে দলে যা ইচ্ছে তা করার দিকে ধাবিত হচ্ছে; আরেক শ্রেণির মানুষ নানারকম কুসংস্কারে বিশ্বাসের ফলে এর পূর্ণ আনন্দ উপভোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করছে। এ ধরনের একটি কুসংস্কার হলো মিলনের সময়ের আসন নিয়ে। অনেকে মনে করেন—স্ত্রীকে স্বামীর সামনেই রাখতে হবে কিংবা স্বামীকে ওপরেই থাকতে হবে, এমন করা যাবে না, অমন করা যাবে না, কথা বলা যাবে না ইত্যাদি। কিন্তু এগুলো ঠিক নয়। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য সম্পূর্ণ হালাল। স্ত্রীর যোনিপথে সহবাসের হালাল পদ্ধতি বজায় রেখে যে আসনে যেভাবে ভালো লাগে সেভাবেই উপভোগ করুন। ইহুদিদের মধ্যে এমন কিছু কুসংস্কার অনেক আগে থেকেই আছে। ইহুদিরা বলতো স্ত্রীর পেছন দিক দিয়ে (পেছন অর্থ পায়ুপথ নয়; বরং যোনিপথ দিয়ে, তবে পেছন পার্শ্ব থেকে) মিলন করলে সন্তান ট্যারা বা বিকলাঙ্গ হয়। তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্ কুরআনের আয়াত নাযিল করে তাদের ধারণাকে অপনোদন করে দেন। তিনি বলেন:

> « তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের শস্যক্ষেতস্বরূপ; তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে মন চায় সেভাবে উপগত হও। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২২৩)

অতএব ইসলামে এই কুসংস্কারের কোনো স্থান নেই। আল্লাহ যেখানে মানুষকে সুযোগ দিয়েছেন, স্বাধীনতা দিয়েছেন; সেখানে নিজেদের ওপর অকারণে কোনো সীমাবদ্ধতা আরোপ করে নেওয়াটা মোটেই ঠিক নয়; বরং বিভিন্ন আসনে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে শারীরিক মিলন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অন্তরঙ্গতা ও ভালোবাসার মাত্রা আরও

---

[১৩৯] হাদীসটি ইমাম বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

বৃদ্ধি করে দেবে। আসন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত নিত্য-নতুনত্বের আনন্দ জীবনকে আরও রাঙিয়ে তুলতে পারে।

পায়ুপথে সংগম

একটি প্রবাদ আছে সমাজে। পোলাও পচলে খাওয়া যায় না; ভাত পচলে ধুয়ে খাওয়া যায়। মানুষকে আল্লাহ যেমন সকল সৃষ্টির মাঝে সর্বোত্তম সৃষ্টি করেছেন, তেমনি একশ্রেণির মানুষ নিজেদেরকে সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে নামিয়ে নিয়েছে। এই নিকৃষ্টতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো—পায়ুপথে তথা পায়খানার পথ দিয়ে সংগম করা। সৃষ্টিজগতের কোনো পশু-প্রাণীও এমন নিকৃষ্ট পন্থা গ্রহণ করে না। এটি একধরনের বিকৃত রুচির পরিচায়ক। স্বাস্থ্যগত দিক থেকেও এটি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ইসলামে এটি হারাম ও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইবন উদাই'র বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

> "যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর পশ্চাদ্দেশ দিয়ে সংগম করে সে অভিশপ্ত।" [১৪০]

অনেক দুশ্চরিত্র ব্যক্তি স্ত্রীদেরকে নানাভাবে এমনকি ডিভোর্সের ভয় দেখিয়ে এ কাজে বাধ্য করে। স্ত্রীর জন্য স্বামীর এ ইচ্ছায় সাড়া দেওয়া একেবারেই হালাল নয়; সাড়া দিলে স্বামীর সাথে সাথে সে নিজেও পাপী হবে। যদি কোনো স্বামী এই জঘন্য কাজ করে তা হলে সেই স্ত্রীর উচিত এমন দুশ্চরিত্র স্বামী থেকে কালবিলম্ব না করে ডিভোর্স নিয়ে নেওয়া। এটা স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্যও মারাত্মক ক্ষতির কারণ, হয়ে দাঁড়াতে পারে। মল আটকে রাখার যে কন্ট্রোলিং সিস্টেম থাকে পায়ুপথে, সেটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই এই অনৈতিক ও জঘন্য হারাম কাজ থেকে দূরে থাকা বাধ্যতামূলক।

ঋতুস্রাব ও নেফাস চলাকালীন অবস্থার বিধান

ঋতুস্রাব চলাকালীন এবং সন্তান প্রসবের পর নেফাস চলাকালে স্ত্রীর সাথে সংগম করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

> « তারা তোমাকে মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে; তুমি বলো, এটা (এ সময়ে সংগম) একটা ক্ষতিকর বিষয়; অতএব ঋতুস্রাবের সময় নারীদের (সাথে সংগম) থেকে দূরে থাকো...। (সূরা আল বাকারা, আয়াত ২২২)

---

[১৪০] মুসনাদ আহমাদ, ২/৪৭৯, সহীহ আল জামি ৫৮৬৫ ইমাম আলবানি সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

সন্তান প্রসবের পর নেফাস কতদিন গণনা হবে তা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য রয়েছে আলিমদের মধ্যে। কেউ বলেছেন ষাট দিন, কেউ বলেছেন চল্লিশ দিন; আবার কেউ বলেছেন এর নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই, রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত এর মেয়াদ। তবে দালিলিক দিক থেকে চল্লিশ দিনের অভিমতটাই সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমদের অভিমত।

যদি কোনো ব্যক্তি হায়েজ বা নেফাস চলাকালে স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তা হলে তার কাফ্ফারা হলো এক অথবা আধা দীনার সমপরিমাণ অর্থ সাদাকাহ করা। এ বিষয়ে সুনান গ্রন্থসমূহে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এসে ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সংগমে লিপ্ত হওয়ার কথা জানান। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পরিমাণ অর্থ কাফ্ফারা দিতে বলেন। হাদীসটি ইমাম আলবানি আদাবুয যাফাফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং সহীহ্ সাব্যস্ত করেছেন।

তবে এই অবস্থায় স্ত্রীর নৈকট্য গ্রহণ এবং তার শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে সুখ উপভোগ করা নিষিদ্ধ নয়। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনাতে আইশাহ ﷺ বলেন, "আমাদের কারও ঋতু শুরু হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কাপড়ের পট্টি বেঁধে নিতে বলতেন এবং তিনি তার সাথে ঘুমোতেন।"

হস্তমৈথুন নিয়ে বিভ্রান্তি

হস্তমৈথুন নিয়ে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি আছে। কেউ মনে করে—এটা সর্বাবস্থায় বৈধ, কেউ মনে করে কখনোই না, কোনোভাবেই বৈধ নয়। সঠিক কথা হলো—নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই স্বমেহন ও হস্তমৈথুন সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ হারাম। তবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করা বৈধ। বিশেষত স্ত্রীদের কেউ যদি হায়েজ কিংবা নেফাস অবস্থায় থাকে এবং স্বামী যদি উত্তেজনা অনুভব করে তা হলে এভাবে স্ত্রী স্বামীর চাহিদা পূরণ করে দিতে পারে।

স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করা

সহবাসের সময় স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। মানব-ইতিহাসের বিভিন্ন সভ্যতায় নারীকে শুধু ভোগের বস্তু বানানো হয়েছে। তাকে ভোগ করা হয়েছে কিন্তু তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার দিকে খেয়াল রাখা হয়নি। ইসলাম এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক। এ কারণে আনাস বিন মালিকের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

> “পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের সময় যেন পরিপূর্ণভাবে (সহবাস) করে। নিজের চাহিদা পূরণ করে স্ত্রীর চাহিদা অপূর্ণ রেখে সে যেন তাড়াহুড়া না করে।”[১৪১]

জৈবিক চাহিদা পূরণ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ। পুরুষ যদি স্ত্রীকে শারীরিকভাবে সুখী করতে না পারে, তা হলে সে যদি গোটা পৃথিবীও স্ত্রীর পায়ে এনে ঢেলে দেয় তবুও তাদের মাঝে দাম্পত্য সুখ থাকবে না; এ ব্যাপারে পুরুষদের খেয়াল রাখা উচিত। কারণ, প্রথমত, এটা সুস্পষ্ট যুলমের পর্যায়ে পড়ে যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। দ্বিতীয়ত, দিন শেষে এটা তার নিজের জীবনের ওপরই অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

আজল করা

স্ত্রীর যদি আপত্তি না থাকে তা হলে স্বামীর জন্য আজল করা তথা যোনির বাইরে বীর্যপাত করা বৈধ। জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, “আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জামানায় আজল করতাম এবং তিনি এটা শুনেছেন কিন্তু নিষেধ করেননি। [১৪২]

তবে স্ত্রী যদি অনুমতি না দেয় তা হলে বৈধ নয়। কেননা, সংগম থেকে পূর্ণ তৃপ্তি লাভ এবং সন্তান ধারণ করা স্ত্রীর অধিকার। তবে বিদ্বানগণ এটা না করতেই বলেন। কেননা, এর দ্বারা বিবাহের কিছু মৌলিক উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়, যেমন: স্ত্রীর পূর্ণ শারীরিক তৃপ্তি এবং সন্তান জন্মদান।

একাধিকবার সহবাস করা

কেউ যদি অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিকবার সংগম করতে চায় সেক্ষেত্রে প্রতিবার সংগম শেষ করে বিরতির সময়ে ওযু করে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

> “তোমাদের কেউ যদি স্ত্রীগমনের পর পুনরায় গমন করতে চায় তা হলে সে যেন দুবারের মাঝখানে ওযু করে নেয়; এটা দ্বিতীয়বারের জন্য শক্তি যোগাবে।”[১৪৩]

এমনকি যদি দুবার সংগমের মাঝখানে গোসল করে নিতে পারে সেটা আরও উত্তম। আবু রাফি ﷺ বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের কাছে গেলেন

---

[১৪১] মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, হাদীস নং-১০৪৬৮

[১৪২] সহীহ বুখারী ৯/২৫০, সহীহ মুসলিম ৪/১৬০

[১৪৩] সহীহ মুসলিমে বর্ণিত ১/১৭১

এবং এই স্ত্রীর ঘরেও গোসল করলেন, সেই স্ত্রীর ঘরেও গোসল করলেন। আবু রাফি বলেন,

> "আমি তখন তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, 'আপনি কেন একবারই গোসল করলেন না?' তিনি বলেন 'এটা অধিক উত্তম, অধিক পবিত্র ও অধিক পরিচ্ছন্নতা'।" [১৪৪]

তবে এটা ফরয নয়, বরং মুস্তাহাব এবং গোসলকে বিলম্বিত করা জায়েয হলেও অকারণে বিলম্ব করা মাকরূহ। সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরবর্তী সালাতের ওয়াক্তের সময় গোসল করে সালাত আদায় করতে হবে।

সহবাসের পর গোসল করা

দুভাবে মানুষ জুনুবী তথা গোসল ফরয হওয়ার মতো অপবিত্র হয়ে পড়ে। একটি হলো, বীর্যপাতের মাধ্যমে—হোক তা ঘুমন্ত কিংবা জাগ্রত অবস্থায়। দ্বিতীয় হলো, নারীর লজ্জাস্থানে পুরুষাঙ্গ প্রবেশের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে বীর্যপাত হওয়ার কোনো শর্ত নেই। শুধু পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ নারীর যোনিতে প্রবেশ করলেই গোসল ফরয হয়ে যাবে।

স্বামী-স্ত্রীর জন্য একই গোসলখানায় একত্রে গোসল করা বৈধ; যদিও একে অপরকে দেখতে পায়। আইশাহ ﷺ বলেন,

> "রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আমি একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে (একসাথে) গোসল করতাম। আমরা পালাক্রমে পানি তুলতে পাত্রের মধ্যে হাত দিতাম। তিনি আমার চেয়ে বেশি পানি নিতেন। এমনকি আমি বলতাম, 'আরে আমার জন্য কিছুটা রাখুন, আমার জন্য কিছুটা রাখুন।' অতঃপর তিনি বলেন, তারা উভয়ে তখন জুনুবী অবস্থায় ছিলেন।" [১৪৫]

পরস্পরের গোপনীয়তা প্রকাশ না করা।

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পরস্পরের পোশাক বলেছেন। পোশাক এবং শরীরের মাঝে যেমন কোনো আবরণ থাকে না, তেমনি স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও কোনো আবরণ থাকে না। উভয়েই উভয়ের সবকিছু জানে ও দেখে। তাই তাদের জন্য পরস্পরের গোপনীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা খুবই জরুরি। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

---

[১৪৪] আবু দাউদ ও নাসা'ঈতে সংকলিত ১/৭৯

[১৪৫] সহীহ বুখারী ও মুসলিম

> “কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবার পর তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেয়।”[১৪৬]

[১৪৬] সহীহ মুসলিম ৪/১৫৭

স্ত্রী যখন একাধিক

ইসলাম একজন পুরুষকে একসাথে সর্বোচ্চ চার জন নারীকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে স্ত্রীদের মধ্যে যেন ইনসাফ তথা সমতা ও সুবিচার নিশ্চিত করা হয় তার উপর চূড়ান্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴾

« আর যদি তোমরা আশঙ্কা করো, ইয়াতীম মেয়েদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ করতে পারবে না, তা হলে তোমরা বিয়ে কোরো নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দুটি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় করো, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে অবিচারের আশঙ্কা কমবে।[১৪৭] »

সুতরাং, কোনো পুরুষ যদি একাধিক স্ত্রীর সাথে ন্যায়সংগত এবং সুবিচারপূর্ণ আচরণ করতে পারে, তা হলে সে একের অধিক বিয়ে করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। এখানে 'ন্যায় সংগত' এবং 'সুবিচারপূর্ণ' আচরণ বলতে পার্থিব সকল ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারকে বুঝানো হয়েছে। যেমন: ধারাবাহিক ক্রম বজায় রেখে প্রত্যেক স্ত্রীকে সমপরিমাণ সময় দেওয়া, খাদ্য, পোশাক-আশাক এবং বাসস্থানের ব্যাপারে তাদের প্রত্যেকের প্রতি সমানভাবে যত্নবান হওয়া ইত্যাদি।

সমপরিমাণ সময় দেওয়া

একাধিক স্ত্রী থাকলে স্বামীর কর্তব্য হলো—প্রত্যেক স্ত্রীকে ধারাবাহিক ক্রমানুযায়ী সমপরিমাণ সময় দেওয়া; অর্থাৎ স্ত্রীদের প্রত্যেকের সাথে সমানসংখ্যক রাত্রি যাপন

---

[১৪৭] আন-নিসা, ৪:৩।

করা। তিনটি পরিস্থিতি ব্যতীত কোনোভাবেই এই নিয়মের লঙ্ঘন করা যাবে না:

- কোনো ভ্রমণে যাওয়ার সময় স্বামী যদি একজন স্ত্রীকে সাথে নিয়ে যায়, তা হলে কোন স্ত্রী তার সাথে যাবে, সেটা লটারির মাধ্যমে বাছাই করতে হবে। আইশাহ ﵂ থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী, এটিই ছিল নবীর ﷺ রীতি:

> "যখন নবিজি ﷺ ভ্রমণে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীদের মাঝে লটারি করতেন এবং যার নাম উঠতো, তিনি তাঁর ভ্রমণ সঙ্গী হতেন।"[১৪৮]

- স্ত্রীদের কেউ ইচ্ছে করলে স্বামীর সাথে তার নির্ধারিত দিনটি অন্য স্ত্রীর জন্য ছেড়ে দিতে পারে; যেমনটি সাওদা ﵁ করেছিলেন আইশাহ ﵂-এর জন্য।[১৪৯]
- নববিবাহিতা স্ত্রী যদি কুমারী হয়, তা হলে বিয়ের দিন থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে সাত রাত স্বামীর সাথে রাত্রিযাপনের সুযোগ পাবে। তবে, স্ত্রী কুমারী না হলে তার জন্য তিন রাত। এর পর থেকে স্বাভাবিক ক্রমবণ্টন অনুযায়ী সময় পাবে।

উম্মু সালামাহ্ এবং আনাস ﵁ বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

> "একজন কুমারী (নববধূ) পায় সাত রাত (বাড়তি), আর অকুমারী পায় তিন রাত।"[১৫০]

উম্মু সালামাহ্ আরও বর্ণনা করেন, যখন নবিজি ﷺ তাকে বিয়ে করেন, তিনি তাঁর সাথে তিন রাত অবস্থান করেন এবং তারপর তাকে বলেন:

> "তোমাকে তোমার পরিবারের সামনে লজ্জিত হতে হবে না। যদি তুমি চাও, আমি তোমার সাথে সাত রাত অবস্থান করব এবং তারপর আমার অন্য স্ত্রীদের প্রত্যেকের সাথে সাত রাত করে অবস্থান করব; অথবা যদি তুমি চাও, তোমার সাথে তিন রাত অবস্থান হয়ে যাওয়ায় এখন আমি অন্যদের সুযোগ দেবো।"[১৫১]

পক্ষপাতমূলক আচরণ না করা

একাধিক স্ত্রীদের মধ্যে পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হলে তা হবে নির্যাতনমূলক কাজ বা যুলুম হিসেবে গণ্য, যা শেষ বিচারের দিনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

---

[১৪৮] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[১৪৯] ৫ম অধ্যায়ে সাওদাহর জীবনী দেখুন।

[১৫০] হাদীসটি মুসলিম এবং ইবনু মাজাহ্সহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[১৫১] হাদীসটি মুসলিম, আবু দাউদ এবং ইবনু মাজাহ্ সংকলন করেছেন।

> "যার দুজন স্ত্রী আছে এবং অন্যায়ভাবে সে তাদের একজনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, সে কিয়ামতের দিন দেহের একপাশ হেলে পড়া অবস্থায় হাজির হবে।"[১৫২]

সকল স্ত্রীর প্রতি সুবিচারপূর্ণ আচরণের বিষয়টি মনের ভালোবাসা এবং মায়া-মমতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, হৃদয়ের টান এমন একটি বিষয় যা মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। কিন্তু তারপরও, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন, স্ত্রীদের কোনো একজনের প্রতি প্রবল ভালোবাসার কারণে স্বামী যেন তার অন্য স্ত্রী বা স্ত্রীদেরকে অবহেলা করতে শুরু না করে:

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

« যতই চাও না কেন, তোমাদের স্ত্রীদের সাথে (ভালোবাসার ক্ষেত্রে) সমান আচরণ করতে, তোমরা সক্ষম হবে না। তবে পুরোপুরিভাবে একজনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে অন্য জনকে ঝুলন্ত অবস্থার মতো রেখে দিও না (যেমন: তাকে তালাকও দেওয়া হয়নি, আবার সম্পর্কও নেই)। আর তোমরা যদি তোমাদের কর্মসমূহকে সংশোধন করো এবং আল্লাহকে ভালোবাসো, তা হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।[১৫৩] »

অনিবার্যভাবেই নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতে হবে। নিয়মানুবর্তিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যার যথাযথ বাস্তবায়ন হতেই হবে। এই প্রক্রিয়ার রয়েছে নিজস্ব নিয়ম-কানুন। এসব নিয়ম-কানুনের লঙ্ঘন হলে তা এই প্রক্রিয়াকে হয় ক্ষতিগ্রস্ত করবে নয়তো পুরোপুরি বিনষ্ট করে ফেলবে। ফলে হিতে বিপরীত ঘটার আশঙ্কাই বেশি থাকবে।

পুরুষ যেহেতু পরিবারের প্রধান কর্তা, তাই পরিবারের কল্যাণের জন্য তার দায়িত্ব হলো 'পারিবারিক আইন'-এর বাস্তবায়ন করা। স্বামী এবং স্ত্রীর জন্য নিয়মানুবর্তিতার বিধিবিধানগুলো আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্র মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বিধৃত রয়েছে।

---

[১৫২] হাদীসটি আবু দাউদ এবং আন-নাসা'ঈসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ২০১৭ এবং সহীহুল জামে', হাদীস নং ৬৫১৫)।

[১৫৩] আন-নিসা, ৪:১২৯।

ওয়ালীমা বা বৌভাত

ওয়ালীমা (বিয়ে ভোজ) বলতে স্বামী-স্ত্রীর মিলনরাতের পর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং পরিবারের লোকদের জন্য খাবারের যে আয়োজন করা হয় তাকে বোঝায়। ওয়ালীমার আয়োজন করা স্বামীর জন্য ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় কর্তব্য। বুরাইদাহ্ ইবনু আল-হাসিব ﷺ বর্ণনা করেন, 'আলী ﷺ যখন ফাতিমাকে বিয়ে করলেন, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন:

> "অবশ্যই (নববিবাহিত স্বামীর) বিয়ের অনুষ্ঠানে একটি ওয়ালীমা থাকতে হবে।"
>
> তাই সা'দ বললেন, 'আমি একটি ভেড়া নিয়ে আসবো।' আরেক জন লোক বললেন, 'আমি কিছু যব নিয়ে আসবো।'[১৫৪]

ওয়ালীমা অনুষ্ঠানের সময়

রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ্ অনুযায়ী, ওয়ালীমার অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে—হয় বিয়ের রাত্রিতে, নয়তো বিয়ের পরবর্তী প্রথম তিন দিনের যেকোনো দিনে। আনাস ﷺ বর্ণনা করেন:

> "একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের একজনের সাথে বাসর রাত যাপন করলেন, তাই তিনি খাবারের জন্য আমাকে কিছু লোককে নিমন্ত্রণ দিতে পাঠালেন।"[১৫৫]

আনাস ﷺ আরও বর্ণনা করেন:

---

[১৫৪] হাদীসটি আহ্মাদ এবং আন-নাসা'ঈ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৪১৯,এবং আদাবুয্ যিফাফ, পৃষ্ঠা ১৪৪-১৪৫)।

[১৫৫] হাদীসটি আল বুখারি এবং আল বায়হাকী সংকলন করেছেন।

> "যখন নবিজি ﷺ সাফিয়্যাকে বিয়ে করলেন, তখন তার মোহর ছিল তার মুক্তি। এবং তিনি তিনদিন ওয়ালীমা অনুষ্ঠান করলেন।" [১৫৬]

তবে দিনের এই সময়সীমা কোনো বাধ্যতামূলক বিষয় নয়। বিশেষ কারণে একটু এদিক সেদিক হলে সমস্যা নেই; তবে যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই আয়োজন করতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

ওয়ালীমার খাবার হিসেবে গোশতকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং সম্ভব হলে কমপক্ষে একটি ভেড়া বা একটি ছাগলের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে ওয়ালীমার জন্য গোশত কোনো শর্ত নয়। ওয়ালীমার আয়োজন করা স্বামীর দায়িত্ব। তবে অন্যান্য মুসলিমের জন্য এর আয়োজনের ব্যয় নির্বাহে সহায়তা করার অনুমতি আছে। ওপরে আমরা দেখেছি, একাধিক মুসলিম 'আলী ্ক-কে তার ওয়ালীমার আয়োজন করতে সাহায্য করেছিল।

যাদেরকে আমন্ত্রণ করতে হবে

নববিবাহিত স্বামী ওয়ালীমার আয়োজনে তার পরিবারসহ মুসলিম আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং পরিচিতদেরকে, বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহভীরু ও সৎকর্মশীল তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাবে। আবু সা'ঈদ আল-খুদ্‌রি ্ক বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "মু'মিন ছাড়া অন্যের সঙ্গী হবে না এবং দীনদার ব্যক্তি ছাড়া অন্যকে তোমার খাবার খাওয়াবে না।"

পাপাচারী ব্যক্তিদেরকে এবং অমুসলিমদেরকে নিমন্ত্রণের তালিকা থেকে একেবারেই বাদ দিতে হবে; যদি না তাদেরকে আমন্ত্রণ করার পেছনে কোনো গুরুত্বপূর্ণ এবং ভালো উদ্দেশ্য থাকে। যেমন: অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের নিকট ইসলামের দা'ওয়াত পৌঁছানোর পরিবেশ সৃষ্টি করা। তবে শর্ত হলো, তাদের উপস্থিতি যেন কোনোভাবেই আমন্ত্রিত অতিথিদের ওপর কোনো প্রভাব না ফেলে। ওয়ালীমায় আমন্ত্রণ জানানোর ক্ষেত্রে ধনী-গরিবদের মাঝে কোনোই ভেদাভেদ করা যাবে না। আবু হুরায়রা ্ক বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন:

---

[১৫৬] হাদীসটি আবু ইয়া'লা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (আদাবুয্ যিফাফ, পৃষ্ঠা ১৪৬)।

> "সেই ওয়ালীমার খানা সবচেয়ে নিকৃষ্ট যাতে বিত্তবানদের নিমন্ত্রণ করা হয় কিন্তু গরিবদের করা হয় না। এবং যে (ওয়ালীমার) নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল, নিশ্চয়ই সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করল।" [১৫৭]

আমন্ত্রণকারীর আদবকেতা

লোকজনকে বিয়ের ওয়ালীমা কিংবা কোনো খাবার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর সময় আমন্ত্রণকারীকে কিছু নির্ধারিত আদবকেতা মেনে চলতে হয়। এগুলোর কয়েকটি পূর্বের অংশে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে অবশিষ্ট গুরুত্বপূর্ণগুলো উল্লেখ করা হলো:

অনেকে আছেন যারা নিজেদের ধনসম্পদ এবং সামাজিক অবস্থানের ব্যাপারে মানুষের মাঝে জাহির করতে ভালোবাসেন। এ জন্য তারা বিভিন্ন ব্যয়বহুল হোটেল কিংবা কমিউনিটি সেন্টারে অতিথি অভ্যর্থনাসহ অতি-আড়ম্বরপূর্ণ ভোজের আয়োজন করে থাকেন, যাতে নিজেদের সাধ্যাতীত খরচ করে দামি সব খাবার-দাবার পরিবেশন করা হয়। ফলে এই অপব্যয়ী খরচের ধকল তাদেরকে বহুবছর ধরে পোহাতে হয়। এমনটি করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এতে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

> কোনোভাবেই অপব্যয় করবে না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।[১৫৮]

এ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও বলেন:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

« খাও এবং পান করো, কিন্তু অপচয় কোরো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।[১৫৯] »

আল-মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

---

[১৫৭] হাদীসটি মুসলিমসহ অন্যান্যরা আবু হুরায়রা, ইবনু 'আব্বাস, এবং ইবনু 'উমার থেকে সংকলন করেছেন। উক্তিটি আবু হুরায়রার হওয়ায়, আল-বুখারি এবং মুসলিমের কিছু বর্ণনা এটিকে মাউকুফ বলে ইঙ্গিত করে। তবে অন্যান্য সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, এটি নবিজি ﷺ এর বক্তব্য। (দেখুন, ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৯৪৭ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১০৮৫)।

[১৫৮] আল-ইস্‌রা, ১৭:২৬-২৭।

[১৫৯] আল-আ'রফ, ৭:৩১।

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বৈশিষ্ট্য ঘৃণা করেন: অনর্থক গালগল্প, অর্থ অপচয় করা এবং ভিক্ষা করা।" [১৬০]

ভোজ এবং ওয়ালীমার অনুষ্ঠানগুলোতে কিছু মানুষের অপব্যয়ের আরেকটি ধরন হলো, সোনা অথবা রুপোর থালায় কিংবা সোনা বা রুপোর প্রলেপযুক্ত কোনো সঙ্কর ধাতুর তৈরি থালা-বাসনে খাবার পরিবেশন করা।

অনেক বিশেষজ্ঞ রুপোর প্রলেপযুক্ত সঙ্কর ধাতুর থালা ব্যবহার করাকে অনুমোদন দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে তাদের শর্ত হলো, সেই প্রলেপ এতটাই পাতলা হতে হবে যেন তা পাত্রের মূল উপাদানের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য হয়। যাই হোক, এই ধরনের থালা-বাসন ব্যবহার করার বিষয়টি তারপরও সন্দেহযুক্ত (শুবহাহ্); এবং উত্তম হলো এসবের ব্যবহার পরিহার করা।

যতটুকু সংগতি আছে তার মধ্যে থেকে, নববিবাহিত স্বামীর উচিত যত বেশি সম্ভব লোকজনকে সম্ভব ওয়ালীমার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো। জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ্ ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য হলো সেটি যাতে অনেকগুলো হাত অংশগ্রহণ করে।" [১৬১]

আমন্ত্রণকারীর ওপর আমন্ত্রিত অতিথিদের কিছু অধিকার রয়েছে। যেমন তাদের সাথে উত্তম আচরণ করতে হবে এবং তাদেরকে সম্মান জানাতে হবে। অতিথিকে সম্মান করা প্রকৃত ঈমানের লক্ষণ। আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে আল্লাহ এবং বিচারের দিনে বিশ্বাস করে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে; যে আল্লাহ এবং বিচারের দিনে বিশ্বাস করে, সে যেন তার আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করে; এবং যে আল্লাহ এবং বিচারের দিনে বিশ্বাস করে, সে যেন উত্তম কথা বলে, না হয় চুপ থাকে।" [১৬২]

---

[১৬০] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[১৬১] হাদীসটি ইবনু হিব্বাহ এবং আল-বায়হাকিসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ১৭১ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৮৯৫)।

[১৬২] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

অতিথিদের আদবকেতা

বিয়ের ওয়ালীমা বা অন্য কোনো ভোজের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলে অতিথিদের জন্যও কিছু আদবকেতা মেনে চলা সমীচীন। এই অংশে আমরা এমনই কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার তুলে ধরব।

আমন্ত্রণ গ্রহণ করা দীনি দায়িত্ব

কোনো বৈধ এবং ইসলামসম্মত কারণ, না থাকলে, কাউকে ওয়ালীমার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হলে সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক। ইবনে 'উমার ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যখন তোমাদের কাউকে ওয়ালীমায় নিমন্ত্রণ জানানো হয়, তখন তার অংশগ্রহণ করা উচিত – যদি তা বিয়ের অনুষ্ঠান বা তেমন কিছু হয়। আর যে (বৈধ কারণ, ছাড়া) নিমন্ত্রণে সাড়া দেয় না, নিশ্চয়ই সে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে।"[১৬৩]

ইবনে হাজার উল্লিখিত হাদীস থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন, আমন্ত্রণ গ্রহণ করা ওয়াজিব; কারণ, কেউ তা না করলে সে হবে দীনের বিরুদ্ধাচরণকারী।[১৬৪] উপরন্তু, এই হাদীসে রয়েছে নবিজি ﷺ-এর পক্ষ থেকে হুকুম। ফলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, আমন্ত্রণ গ্রহণ করা ওয়াজিব।

এই উপলব্ধির আলোকে, এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে হবে ঈমান (আমন্ত্রণ গ্রহণ করার দীনি মর্যাদাকে বিশ্বাস করে) এবং ইহ্‌তিসাব (অংশগ্রহণের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার চাওয়া) সহকারে। শর্ত দুটো যদি আন্তরিকতার সাথে পূর্ণ করা হয়, তা হলে ওয়ালীমার অনুষ্ঠানে যোগদান করা একটি পুরস্কারযোগ্য ইবাদত হয়ে যাবে।

এমন কোনো কারণ, যদি থাকে যা ওয়ালীমার অনুষ্ঠানে যোগদান করাকে ব্যক্তির স্বাভাবিক সাধ্যের অতীত বলে প্রমাণ করে, তা হলে সেই কারণটি ওয়ালীমার অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়ার পেছনে একটি বৈধ কারণ, হতে পারে। সেইদিক থেকে, নিম্নোক্ত কারণগুলো বৈধ কারণ, হিসেবে পরিগণিত হতে পারে:

---

[১৬৩] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। হাদীসের যে অংশটির মাধ্যমে বিবাহের বিষয়টিকে নির্ধারণ করা হয়েছে সে অংশটুকু আবু ইয়া'লা সংকলন করেছেন এবং আল-আলবানি তা সহীহ বলে সত্যয়ন করেছেন (আদাবুয-যিফাফ, পৃষ্ঠা ১৫৪)

[১৬৪] ফাতহুল বারী।

- একই সময়ে দুটো ভিন্ন জায়গায় দুটো ভিন্ন ভিন্ন ওয়ালীমার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলে।
- অনেক টাকা খরচ করে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করে কোনো ওয়ালীমার অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হলে।
- ওয়ালীমার অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়েই অন্য কারও সাথে জরুরি সাক্ষাৎ বা অন্য কোনো স্থানে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন থাকলে। যেমন: স্কুলের পরীক্ষা, কোনো ব্যবসায়িক চুক্তির আলোচনা ইত্যাদি।

যাই হোক, যদি কোনো ব্যক্তির এ ধরনের কোনো জরুরি কারণ, থাকেও, যার কারণে সে অনুষ্ঠানে যোগদান করতে অপারগ, সেক্ষেত্রে তার উচিত আমন্ত্রণকারীর সাথে যোগাযোগ করে যথাসময়ের পূর্বেই তাকে তার না যাওয়ার কারণ, অবহিত করা।

যেসব ওয়ালীমার অনুষ্ঠানে মদ্যপান, গান-বাজনা, নৃত্য, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সহ এ ধরনের কার্যকলাপের মাধ্যমে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করা হয় সেসব অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

'আলী ইবনু আবি ত্বলিব ﷺ বর্ণনা করেন, তিনি কিছু খাবারের আয়োজন করেন এবং নবিজি ﷺ-কে ﷺ আমন্ত্রণ জানালেন। নবিজি ﷺ এসে কিছু ছবি দেখতে পেলেন এবং ফিরে যেতে চাইলেন। 'আলী বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি কেন ফিরে যেতে চাচ্ছেন?" তিনি ﷺ উত্তর দিলেন:

> "নিশ্চয়ই বাড়িতে একটি পর্দা আছে যাতে ছবি আছে; এবং ছবি আছে এমন কোনো বাড়িতে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।"[১৬৫]

প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়া

ওয়ালীমা বা এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলোতে আমন্ত্রণকারী সাধারণত আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য ফটকে অপেক্ষায় থাকেন। তাই অনুষ্ঠানে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি চাওয়ার খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে না, বিশেষ করে অনুষ্ঠানটি যদি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোনো স্থানে আয়োজন করা হয়।

---

[১৬৫] হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ এবং আবু ইয়া'লা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি তা সহীহ বলে সত্যায়ন করেছেন (আদাবুয-যিফাফ, পৃষ্ঠা ১৬১)

তবে যদি কোনো ব্যক্তিগত বাসভবনের অনুষ্ঠানে খাবার পরিবেশন করা হয় তা হলে আমন্ত্রিত অতিথিকে অবশ্যই ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

« হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশ কোরো না, যতক্ষণ না তোমরা গৃহবাসীর অনুমতি নেবে এবং তাদেরকে সালাম দেবে। এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।[১৬৬] »

বেশ কিছু কারণে অনুমতি চাওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

- আমন্ত্রণকারী অতিথিদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন এবং সর্বদাই খেয়াল রাখবেন যেন বাড়ির মহিলাদের পর্দার ব্যাঘাত না ঘটে।
- যারা প্রবেশের জন্য অনুমতি চাচ্ছেন তাদের সকলেই আমন্ত্রিত কি না, তা যাচাই করার জন্য আমন্ত্রণকারীর সুযোগ থাকতে হবে।

সালাম জানানো এবং করমর্দন করা

কোনো মুসলিম যখন তার অন্য কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তাদের মধ্যে পরস্পর সালাম জানাতে হবে। একইভাবে, যখন কেউ কারও বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে বা অন্য কোনো কারণে প্রবেশ করবে, তখন বাড়িতে অবস্থানকারী লোকদেরকে তার সালাম জানাতে হবে।

মুসলিম হয়েও অনেকেই একে অপরকে অনৈসলামী রীতিতে সম্ভাষণ জানিয়ে থাকেন, যেমন: 'গুড নাইট', 'হাই' ইত্যাদি। এসব বর্জন করতে হবে—এগুলো অমুসলিমদের কালচার। এগুলো করে নিজেদেরকে সম্ভ্রান্ত ও গর্বিত ভাববেন না। কারণ, আল্লাহ আমাদেরকে অধিক উত্তম সম্ভাষণের রীতি শিক্ষা দিয়েছেন; আর তা হলো—সালাম। সালামের মাধ্যমে কারও শান্তি কামনা করা হয়। আর এই 'সালাম'-ই হলো ফেরেশতামণ্ডলী এবং জান্নাতের অধিবাসীদের সম্ভাষণ।[১৬৭]

---

[১৬৬] আন-নূর; ২৪:২৭।

[১৬৭] এ ক্ষেত্রে সূরা আর রা'দ; ১৩:২৪ দেখুন।

অনেকেই আবার অমুসলিমদের মতো দেখা হলেই একে অন্যকে আলিঙ্গন এবং করমর্দন (Handshake) করে থাকেন। দীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতির পর কারও সাথে সাক্ষাৎ করার ক্ষেত্রেই কেবল আলিঙ্গনের বিষয়টি নির্ধারিত থাকা উচিত। যেকোনো পরিস্থিতিতে মুসলিমদের একজনের আরেক জনের সাথে দেখা হলে উচিত পরস্পরকে সালাম জানানো এবং মুসাফা করা।

অনুষ্ঠানে খাবার খাওয়ার আদব

আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া বা তা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হলেও অনুষ্ঠানে গিয়ে খাবার খাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। নিজের পরিস্থিতি-সাপেক্ষে আমন্ত্রিত ব্যক্তি চাইলে খেতেও পারেন, আবার না-ও খেতে পারেন। না খেতে চাইলে তার উচিত হবে তার না খাওয়ার কারণ, জানিয়ে দেওয়া, যাতে আমন্ত্রণকারী মনে কষ্ট না পান। তবে সামান্য পরিমাণে হলেও খাওয়াটাই উত্তম।

সিয়াম পালনকারীদের করণীয়

সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি ওয়ালীমার অনুষ্ঠানেও সিয়াম অবস্থায় থাকতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তিনি খাবার গ্রহণ না করে, আমন্ত্রণকারীর জন্য দু'আ করবেন। তবে কেউ যদি নফল সিয়াম রেখে থাকেন তা হলে তার জন্য সিয়াম ভঙ্গ করাই হলো মুস্তাহাব; বিশেষ করে যদি তিনি এমনটি আশা করেন, তিনি খেলে আমন্ত্রণকারী খুশি হবেন।

আবু সা'ঈদ আল খুদ্রি ﵁ বর্ণনা করেন, তিনি একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্য কিছু খাবার তৈরি করলেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর কিছু সাহাবাকে সাথে নিয়ে এলেন। যখন খাবার আনা হলো, 'আমি সিয়াম রেখেছি' বলে একজন সরে রইলেন। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন:

> "তোমার ভাই তোমাকে দাওয়াত দিয়েছেন এবং তোমার জন্য কষ্ট করেছেন! সিয়াম ভঙ্গ করো এবং চাইলে অন্য কোনো দিন সিয়াম থেকো।"[১৬৮]

এই হাদীস আরও ইঙ্গিত করে, নফল সিয়াম কাযা করাও বাধ্যতামূলক নয়।

[১৬৮] হাদীসটি আল-বায়হাকি এবং আত-তাবারানি (আল-আসওয়াত গ্রন্থে) সহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৯৫২ এবং আদাবুয্ যিফাফ, পৃষ্ঠা ১৫৯)।

আল্লাহর নাম নিয়ে খাবার খাওয়া

খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' অর্থাৎ 'আল্লাহর নামে' বলে শুরু করতে হবে। এখানে লক্ষ্য রাখা জরুরি, আল্লাহর নাম নেওয়া ছাড়া বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত এমন আর কোনো দু'আ বা যিক্‌র নেই যা খাবার গ্রহণের সময় বা তার পূর্বে বলতে হবে। অন্য যে দু'আসমূহ লোকজনে সচরাচর খাওয়ার আগে বলে থাকে সেগুলোর কোনো শার'ঈ ভিত্তি নেই; অতএব সেগুলো পরিত্যাজ্য।

খাবারের সমালোচনা না করা

সকল হালাল খাবারই হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে নি'য়ামাহ্। এসবের সমালোচনা করা আমাদের উচিত নয়। কারণ, এতে আল্লাহর প্রতি আমাদের অসন্তুষ্টি এবং অকৃতজ্ঞতা প্রমাণিত হয় এবং আমন্ত্রণকারীর গীবত চর্চা হয়; এতে আমন্ত্রণকারী মনে কষ্ট পেতে পারেন।

পরিমিত পরিমাণে খাওয়া

কোনো ওয়ালীমার অনুষ্ঠান, কোনো রেস্তোরাঁ কিংবা কমিউনিটি হল, নিজের বাড়ি, যেখানেই খান না কেন; খাবার বাহারি হোক, সুস্বাদুহোক আর একেবারেই সাধারণ এবং অরুচির হোক—কখনোই অতিরিক্ত পরিমাণে খাবার খাওয়া উচিত নয়। অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি ছাড়াও, আলসেমি সৃষ্টি হয়, যা আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাঁর ইবাদাতে মনোযোগী হওয়া থেকে বিচ্যুত করে। একজন মু'মিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, সে কখনো উদর পূর্তি করে অতিরিক্ত পরিমাণে খায় না। আবু হুরায়রা, আবু মুসা আল-আশ'আরি এবং 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নিশ্চয়ই একজন মু'মিন এক পেটে খায় (অর্থাৎ অল্প খাবারে তুষ্ট থাকে), আর একজন কাফির সাত পেটে খায় (অনেক বেশি পরিমাণে খায়) ।"[১৬৯]

নবিজি ﷺ অতিভোজনকে অত্যন্ত জোরালোভাবে নিষেধ করেন এবং তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, লোকেরা যা খায় তার অধিকাংশ পরিমাণই তাদের জন্য প্রয়োজনীয় নয়, বরং তা তাদের জন্য ক্ষতিকর। আল-মিকদাম ইবনু মা'দিকারাব ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

---

[১৬৯] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

> "একজন মানুষ তার পেটের চেয়ে খারাপ অন্য কোনো পাত্র পূর্ণ করে না। শরীরটাকে সোজা রাখার জন্য একজন মানুষের কয়েক লোকমা খাওয়াই যথেষ্ট। তবে যদি তা সম্ভব না হয়, তা হলে তার উচিত সে যেন (তার পেটের) এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক-তৃতীয়াংশ তার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য নির্ধারিত রাখে।" [১৭০]

সবাই মিলে একসাথে খাওয়ার বারাকাহ

সবাই মিলে একসাথে খেলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই খাবারে বাকারাহ দেন। এই মর্মে, 'উমার ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "পৃথকভাবে নয়, একসাথে খাও; কারণ, একসাথে থাকলে বারাকাহ থাকে।" [১৭১]

নম্রভাবে বসা এবং পাত্রের একপাশ থেকে খাওয়া

আচরণগত ঔদ্ধত্য আল্লাহর নি'য়ামাতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার একটি লক্ষণ। খাবার গ্রহণের সময় কোনো কিছুতে হেলান দিয়ে কিংবা অহংকার প্রকাশ পায় এমন অঙ্গভঙ্গি করে বসা যাবে না; বরং নম্রভাবে আসন গ্রহণ করতে হবে এবং পরিমিত পরিমাণে খাবার খেতে হবে। ইবনু 'আব্বাদ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "খাবারের মধ্যখানে বারাকাহ অবতীর্ণ হয়; সুতরাং পাশ থেকে খাবার খাও এবং মধ্যখান থেকে খেয়ো না।" [১৭২]

খাবার অপচয় না করা

ইদানীং দেখা যায়, অনেক মুসলিম ওয়ালীমাসহ নানা সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে অতিথিরা ব্যাপক পরিমাণ খাবার অপচয় করে থাকে। অথচ একবার ভেবে দেখুন, কত অসংখ্য মুসলিম ক্ষুধা আর দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণায় জর্জরিত। এই ধরনের চর্চা সুন্নাহর পরিপন্থী। নবিজি ﷺ তাঁর হাতে বা খাবারের থালায় লেগে থাকা সামান্য পরিমাণ খাদ্য তুলে খাওয়ার ব্যাপারেও ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান।

---

[১৭০] হাদীসটি আত-তিরমিযি সহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ২২৬৫)।

[১৭১] হাদীসটি ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৪৫০০ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৬৮৬)।

[১৭২] হাদীসটি আবু দাউদ এবং আত-তিরমিযিসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৯৮০১১)।

আল্লাহর প্রশংসা করা এবং তাঁর নিকট দু'আ করা

কোনো ব্যক্তির উচিত যিনি তাকে খাওয়ালেন সেই একক সত্তার প্রশংসা করার মাধ্যমে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে এটি খাওয়ালেন এবং আমার কোনো শক্তি বা ক্ষমতা ছাড়াই আমার জন্য এটি ব্যবস্থা করে দিলেন, এমনটি বললে তার পূর্বের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" [১৭৩]

আল্লাহর প্রশংসা করার পর, তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা দেখাতে হবে যারা আপনার জন্য খাবারের আয়োজন করেছেন। আর তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানোর সর্বোত্তম উপায় হলো তাদের জন্য দু'আ করা। মিকদাদ ইবনু আল-আসওয়াদ ؓ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর আমন্ত্রণকারীদের জন্য দু'আ করতেন বা তাদেরকে পান করার জন্য কোনো কিছু দিতেন এবং বলতেন:

> "হে আল্লাহ, তাকে খাওয়ান যে আমাকে খাওয়ালো এবং তাকে পান করান যে আমাকে পান করালো।" [১৭৪]

'আবদুল্লাহ্ ইবনু বুস্র ؓ বর্ণনা করেন, একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ তার পিতার অতিথি হলেন। তারা তাঁর সামনে কিছু খাবার এনে দিলে তিনি তা খেলেন। তারপর তারা তাঁকে কিছু দুধ এনে দিলেন এবং তিনি তা থেকে পান করে তাঁর ডান পাশে বসা ব্যক্তিকে তা দিয়ে দিলেন। চলে যাওয়ার সময় নবিজি ﷺ যখন তাঁকে বহনকারী জন্তুটির ওপর আরোহণ করলেন, তখন আব্দুল্লাহ্র পিতা তাঁকে তাদের জন্য দু'আ করার অনুরোধ করলে তিনি বললেন:

> "হে আল্লাহ, তুমি তাদেরকে যা দিয়েছো তাতে বরকত দাও, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, এবং তাদের ওপর দয়া করো।" [১৭৫]

---

[১৭৩] হাদীসটি ইবনু মাজাহ্ এবং আবু দাউদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৬০৮৬ এবং ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৯৮৯)।

[১৭৪] হাদীসটি মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[১৭৫] হাদীসটি মুসলিম সংকলন করেছেন।

প্রস্থান

যথাসময়ের খুব আগে হাজির হয়ে আমন্ত্রণকারী ও তার পরিবারের লোকজনদের কোনোরকম অসুবিধায় ফেলা আমন্ত্রিত ব্যক্তির জন্য ঠিক নয়। পানাহার সম্পন্ন করার পরও দীর্ঘ সময় ধরে অনুষ্ঠানস্থলে অবস্থান করে আমন্ত্রণকারীর জন্য কোনোরকম অসুবিধা সৃষ্টি করাও তার জন্য সমীচীন নয়।

অনুষ্ঠানে প্রবেশের সময় যেভাবে সালাম জানিয়ে প্রবেশ করা হয়েছিল, চলে আসার সময়ও ঠিক সেইভাবে সালাম জানিয়ে প্রস্থান করা উচিত।

নিষিদ্ধ বিয়ে

বিয়ের জন্য চিরতরে নিষিদ্ধ নারী হলো তারাই যাদেরকে কোনো পুরুষ কখনোও বিয়ে করতে পারে না। এই চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার কারণ, হতে পারে রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক সম্পর্ক কিংবা পালক (দুগ্ধপোষ্য) সম্পর্ক। কোনো পুরুষ যে নারীর জন্য মাহরাম সেই নারীকে বিয়ে করা ওই পুরুষের জন্য স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) নিম্নোক্ত আয়াতে যেসব নারীদেরকে বিয়ে করা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ তাদের কথা উল্লেখ করেছেন:

﴿ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾

« আর তোমরা বিয়ে কোরো না নারীদের মধ্য থেকে যাদেরকে বিয়ে করেছে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ। তবে পূর্বে যা সংঘটিত হয়েছে (তা ক্ষমা করা হলো)। নিশ্চয়ই তা হলো অশ্লীলতা ও ঘৃণিত বিষয় এবং নিকৃষ্ট পথ।[১৭৬] »

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

« তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতাদেরকে, তোমাদের মেয়েদেরকে, তোমাদের বোনদেরকে, তোমাদের ফুফুদেরকে, তোমাদের খালাদেরকে, ভাতিজীদেরকে, ভাগ্নীদেরকে, তোমাদের সেসব মাতাকে যারা তোমাদের দুধপান করিয়েছে, তোমাদের দুধবোনদেরকে, তোমাদের

[১৭৬] সূরা আন-নিসা, ৪:২২।

শাশুড়িদেরকে, তোমরা যেসব স্ত্রীদের সাথে মিলিত হয়েছ সেসব স্ত্রীর গর্ভে অপর স্বামীর ঔরশ থেকে জাত কন্যা যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে তাদেরকে, আর যদি তোমরা তাদের সাথে মিলিত না হয়ে থাকো, তবে তোমাদের ওপর কোনো পাপ নেই। এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং দুই বোনকে একত্রে (বিয়ে) করা (তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে)। তবে অতীতে যা হয়ে গেছে তা ভিন্ন কথা। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৭৭] »

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

« আর (হারাম করা হয়েছে) নারীদের মধ্য থেকে সধবাদেরকে। তবে তোমরা যাদের মালিক হয়েছ, তারা (দাসীরা) ছাড়া। এটি তোমাদের ওপর আল্লাহর বিধান এবং এরা ছাড়া অন্য নারীকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তোমরা অর্থের বিনিময়ে তাদেরকে চাইলে বিয়ে করতে পারো, অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হয়ে নয়। সুতরাং তাদের মধ্যে তোমরা যাদেরকে ভোগ করেছ তাদেরকে তাদের নির্ধারিত মোহর দিয়ে দাও। আর মোহর নির্ধারণের পর যে ব্যাপারে তোমরা পরস্পর সম্মত হবে তাতে তোমাদের ওপর কোনো অপরাধ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।[১৭৮] »

বংশগত সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ

উল্লিখিত আয়াতসমূহের আলোকে আমরা অবগত হলাম এই, রক্তের সম্পর্কের কারণে সাত শ্রেণির নারীকে বিয়ে করা একজন পুরুষের জন্য চিরতরে নিষিদ্ধ:

- নিজের মা (এবং নানি ও দাদিদেরকে, এবং এভাবে যত ওপরেই যাক না কেন)।
- নিজের মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে (যত নিচেই যাক না কেন)।
- নিজের বোন (সৎবোন—মায়ের দিক থেকে বা বাবার দিক থেকে, যেদিক থেকেই হোক না কেন)।

---

[১৭৭] সূরা আন-নিসা; ৪:২৩।

[১৭৮] সূরা আন-নিসা; ৪:২৪।

- নিজের ফুফু (একইভাবে বাবার ফুফু, দাদার ফুফু, দাদির ফুফু, মায়ের ফুফু, নানার ফুফু, নানির ফুফু এবং এভাবে যত ওপরেই যাক না কেন)।
- নিজের খালা (একইভাবে বাবার খালা, দাদার খালা,দাদির খালা, মায়ের খালা, নানার খালা, নানির খালা এবং এভাবে যত ওপরেই যাক না কেন)।
- নিজের ভাইয়ের (বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় উভয়) ও তাদের অধস্তন ছেলেদের মেয়ে।
- নিজের বোনের (বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় উভয়) ও তাদের অধস্তন মেয়েদের মেয়ে।

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ

বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে চার শ্রেণির নারীকে বিয়ে করা একজন পুরুষের জন্য চিরতরে নিষিদ্ধ:

- পিতা (এবং দাদা ও নানা এবং এভাবে যত ওপরেই যাক না কেন) যাদেরকে বিয়ে করেছেন। বিয়ের পরে স্ত্রীর সাথে যৌনমিলন না করলেও যেই মুহূর্তে পিতা কোনো নারীর সাথে বিয়ের চুক্তিনামা সম্পাদন করেন, সেই মুহূর্ত থেকেই ছেলের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়।
- আপন ছেলে (ছেলের ছেলে ও মেয়ের ছেলে এবং এভাবে যত নিচেই যাক না কেন) যাদেরকে বিয়ে করেছে। বিয়ের পরে স্ত্রীর সাথে যৌনমিলন না করলেও যেই মুহূর্তে ছেলে কোনো নারীর সাথে বিয়ের চুক্তিনামা সম্পাদন করেন, সেই মুহূর্ত থেকেই পিতার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়।
- শাশুড়িকে (একইভাবে দাদি ও নানি শাশুড়িকে এবং এভাবে যত ওপরেই যাক না কেন)। বিয়ের পরে স্বামীর সাথে যৌনমিলন হোক আর না-হোক, যেই মুহূর্তে সেই নারীর সাথে বিয়ের চুক্তিনামা সম্পাদন হবে, সেই মুহূর্ত থেকেই এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হয়।
- ওই নারীর গর্ভে জন্ম নেওয়া মেয়েকে (এবং তার ছেলের মেয়ে ও মেয়ের মেয়েকে এবং এভাবে যত নিচেই যাক না কেন) যে নারীর সাথে সে যৌনমিলন করেছে।

সৎমেয়েদের (উল্লিখিত ৪ নং) ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মত হলো এই, কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই তাদের সকলেই নিষিদ্ধ হয়ে যাবে যেই মুহূর্তে তাদের সৎপিতা

তাদের মায়ের সাথে যৌনমিলন করবে। এই সকল বিশেষজ্ঞদের মতে, উল্লিখিত আয়াতে (৪:২৩) "তোমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে" এর মাধ্যমে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা সব ধরনের সৎমেয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দুগ্ধসম্বন্ধীয় কারণে নিষিদ্ধ

স্তন্যদায়ী মায়ের দুধ শিশুর পুষ্টি জুগিয়ে শিশুকে বড় করে তোলে। কোনো নারী যখন অন্য কোনো শিশুকেও নিজের বুকের দুধ পান করান, তখন তার সঙ্গে তার গর্ভধারিণী মায়ের মতো সম্পর্ক তৈরি হয়। 'আইশাহ, ইবনু 'আব্বাস এবং 'আলী ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ জন্মগত (রক্ত) সম্পর্কের কারণে যা নিষিদ্ধ করেছেন, দুগ্ধসম্পর্কের জন্যও তা (বিয়ে) নিষিদ্ধ করেছেন।" [১৭৯]

তবে স্তন্যদান করার কারণে বিয়ের জন্য নিষিদ্ধ সম্পর্ক তৈরি হতে হলে অবশ্যই নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূর্ণ হতে হবে:

- পাঁচ বা ততোধিক বার শিশুকে আলাদা আলাদাভাবে দুধপান করাতে হবে।
- শিশুকে ক্ষুধার্ত হতে হবে এবং প্রতিবার স্তন্যদানকালে সে পেটপূর্ণ করে দুধপান করবে।
- এই স্তন্যদান হতে হবে শিশুর দুই বছর বয়সে অন্যান্য খাবারে অভ্যস্ত হওয়ার পূর্বেই।

আইশাহ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "দুএকবার স্তন্যদান করলে নিষিদ্ধ হয় না।" [১৮০]

নিচে আমরা 'দুধ-মা' বলতে সেই নারীকে বুঝিয়েছি যিনি উল্লিখিত শর্তগুলো পূরণ করে কাউকে স্তন্যদান করেছেন। আর 'দুধ-পিতা' হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ওই দুধপানকারী শিশুকে স্তন্যদানকালে ওই নারীর বিবাহিত স্বামী ছিলেন। অর্থাৎ দুধ-পিতার কারণেই দুধ-মাতা ওই দুধপানকারীকে স্তন্যদান করতে পেরেছিলেন।

নিচের ছকে দুগ্ধসম্বন্ধীয় কারণে কোনো পুরুষের সাথে বিয়ের জন্য চিরতরে নিষিদ্ধ আট শ্রেণির নারীদের একটি সাধারণ তালিকা দেওয়া হলো:

---

[১৭৯] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। হাদীসটির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার জন্য ইরওয়া আল-গালীল এর হাদীস নং ১৮৭৬ দেখুন।

[১৮০] হাদীসটি মুসলিম এবং আবু দাউদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

	দুগ্ধসম্বন্ধীয় সম্পর্ক	যেভাবে গণ্য হবে
১	দুধ-মাতা	আপন মাতা
২	দুধ-কন্যা	আপন কন্যা
৩	দুধ-মাতার মাতা	আপন নানি
৪	দুধ-পিতার মাতা	আপন দাদি
৫	দুধ-মাতার বোন	আপন খালা
৬	দুধ-পিতার বোন	আপন ফুফু
৭	দুধ-মাতার ছেলের বা মেয়ের মেয়ে	আপন ভাগনি বা ভাতিজি
৮	দুধ-বোন	আপন বোন

পুরুষের জন্য তার দুধ-বোন তিন ধরনের হতে পারে:

সম্পর্কের বিবরণ	যেভাবে গণ্য হবে
একই দুধ-মা ও দুধ-পিতার মেয়ে	আপন বোন
একই দুধ-মা কিন্তু দুজন দুধ-পিতা	বৈমাত্রেয় বোন
দুজন দুধ-মা কিন্তু একই পিতা	বৈপিত্রেয় পিতা

এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণীয় বিষয় হলো, দুগ্ধ-সম্পর্কের বিষয়টি কেবল ওই ব্যক্তি ও তার পরবর্তী সন্তান-সন্ততিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ব্যক্তি দুধপান করার মাধ্যমে পালিত হয়েছে। এই হুকুম পালিত ব্যক্তির অন্যান্য আত্মীয়, যেমন তার রক্তের ভাই কিংবা বোনদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, "ক" একজন পুরুষ যার দুধ-বোন "খ" এবং আপন ভাই "গ" এবং আপন ছেলে "ঘ"। এখন এ ক্ষেত্রে "ক" এবং "ঘ" এর জন্য "খ" কে বিয়ে করা নিষিদ্ধ। কিন্তু "গ" এর জন্য "খ" কে বিয়ে করা নিষিদ্ধ নয়।

যে সকল নারীকে বিয়ে করা সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ

সাময়িক নিষেধাজ্ঞার কারণে একজন পুরুষ কোনো নারীকে কিছু নির্ধারিত অবস্থা বা পরিস্থিতিতে বিয়ে করতে পারে না। উক্ত অবস্থা বা পরিস্থিতি পেরিয়ে গেলে সেই নিষেধাজ্ঞাও আর বহাল থাকে না এবং সেই নারীকে বিয়ে করা ওই পুরুষের জন্য বৈধ হয়ে যায়। যে সকল নারীকে সাময়িক নিষেধাজ্ঞার কারণে বিয়ে করা বৈধ নয় তারা হলো:

চার জনের অধিক নারীকে বিয়ে করা

কোনো পুরুষের চার জন স্ত্রী থাকলে অন্য যেকোনো নারী তার জন্য নিষিদ্ধ। অর্থাৎ তার চার জন স্ত্রীর কোনো একজনকে তালাক না দিয়ে সে অন্য কোনো নারীকে বিয়ের জন্য বিবেচনা করতে পারবে না। ইসলামে একই সাথে চার জনের বেশি স্ত্রী রাখা কোনো পুরুষের জন্য অনুমোদিত নয়। এমনকি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যাদের চার জনের বেশি স্ত্রী ছিল, নবিজি ﷺ তাদের চার জন স্ত্রী রেখে বাকিদেরকে তালাক দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

একই সাথে দুই বোনকে বিয়ে করা

যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওই নারীর অন্য কোনো বোনকে বিয়ে করা সেই পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ। সেই পুরুষ ওই নারীর বোনদের কাউকেই ততক্ষণ পর্যন্ত বিয়ে করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তাদের বিবাহিতা বোনকে তালাক দিয়েছে।

একই সাথে খালা-ফুফু এবং ভাতিজি-ভাগনিকে বিয়ে করা

একই সাথে খালা বা ফুফু এবং তাদের ভাতিজি বা ভাগনিকে বিয়ে করা বৈধ নয়। এ ক্ষেত্রে তাদের যেকোনো জনকে বিয়ে করার পূর্বে উল্লিখিত সম্পর্কের অন্যজনকে তালাক দিতে হবে।

বিবাহিতা নারীকে বিয়ে করা

এ ব্যাপারে সূরা নিসার উল্লিখিত আয়াতে (৪:২৪) সুস্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। একই হুকুম প্রযোজ্য ওই নারীর ক্ষেত্রেও যাকে চূড়ান্তভাবে তালাক দেওয়া হয়নি

(প্রথম দুই তালাক দেওয়া হয়েছে) এবং সে এখনো তার ইদ্দতের মধ্যেই রয়েছে। এমতাবস্থায়, এই ধরনের নারীকে তার স্বামীর দায়িত্বাধীন বলেই বিবেচনা করা হয় এবং তার ইদ্দত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ তার নিকট বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যেতে পারবে না।

ব্যভিচারিণীদেরকে বিয়ে করা

এমন নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ যে প্রকাশ্যে ব্যভিচারিণী কিংবা পতিতা বলে প্রতিষ্ঠিত; যতক্ষণ না সে তার কৃতকর্মের ব্যাপারে প্রকাশ্যে তাওবা করে।

'আমর ইবনু শু'আইব [১৮১] তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার (শু'আইব) দাদা থেকে বর্ণনা করেন, মারসাদ ইবনু আবি মারসাদ আল-গানাওয়ী মুসলিম বন্দীদেরকে মক্কা থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করতেন। 'উনাইক নামে মক্কার এক পতিতা ছিল তার (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহেলী যুগের) বান্ধবী। সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! আমি কি উনাইককে বিয়ে করতে পারি?' সূরা আন-নূর এর তিন নম্বর আয়াত অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুই বললেন না। তারপর তিনি তাকে ডেকে আনলেন এবং বললেন, "তাকে বিয়ে কোরো না।" [১৮২]

ইহরাম অবস্থায় বিয়ে করা

যে ব্যক্তি হজ্জ কিংবা উমরাহ করতে গেছেন, তার জন্য ইহরাম অবস্থায় পাত্রী দেখা বা বিয়ে করা নিষিদ্ধ।[১৮৩]

গর্ভবতী যুদ্ধবন্দিনীকে বিয়ে করা

আল্লাহর রাসূল ﷺ যুদ্ধবন্দিনীর সাথে (উপপত্নী হিসেবেই হোক আর পূর্ণ স্ত্রী হিসেবেই হোক) যৌনমিলন করাকে নিষিদ্ধ করেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার গর্ভ পূর্ববর্তী

---

[১৮১] 'আমর ইবনু শু'আইব ছিলেন শু'আইব ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস এর ছেলে। সেই সূত্রে, তিনি ছিলেন 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ-এর প্রপৌত্র।

[১৮২] হাদীসটি আবু দাউদ এবং আন-নাসা'ঈসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৮৮৬)।

[১৮৩] ইহরাম: হজ্জ পালনকারীর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এমন একটি পবিত্র মুহূর্ত যে সময়টুকুতে তিনি স্ত্রীর সঙ্গ, সুগন্ধি ইত্যাদির মতো আরও অনেক পার্থিব ইন্দ্রিয় সুখানুভূতি থেকে নিজেকে দূরে রাখেন।

সম্পর্ক থেকে পবিত্র হয়ে যায়। আবু সা'ঈদ আল খুদ্‌রি ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ আওসাত যুদ্ধে বন্দিনীদের ব্যাপারে বলেছিলেন:

> "কোনো গর্ভবতী নারী সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত এবং কোনো গর্ভবতী নারীর (একবার) ঋতুস্রাব শুরু না হওয়া পর্যন্ত কেউ (তাদের সাথে) যৌনমিলন করতে পারবে না।"[১৮৪]

অন্যান্য নিষিদ্ধ বিয়ে

আরও কয়েক ধরনের বিয়ে আছে যেগুলো জাহেলী যুগে কিংবা ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিল যা পরবর্তী সময়ে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নিচে সেগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

মুত'আহ্ বিয়ে

মুত'আহ্ (উপভোগ) বিয়ে হলো একধরনের অস্থায়ী বিয়ে। বিয়ের চুক্তিনামাতেই এই বিয়ের মেয়াদ উল্লেখ করা থাকে। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে কোনো তালাক ছাড়াই স্বামী-স্ত্রী দুজন দুজনা থেকে আলাদা হয়ে যায়।

জাহেলি যুগে এই ধরনের বিয়ে প্রচলিত ছিল। এই ধরনের বিয়ের উদ্দেশ্যই ছিল কেবল পুরুষের কামনা চরিতার্থ করা। ইসলামের প্রথম যুগে কিছুদিনের জন্য এই ধরনের বিয়ে বৈধ ছিল। পরবর্তী সময়ে তা স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "বিয়ে, তালাক, 'ইদ্দত এবং উত্তরাধিকারের মাধ্যমে মুত'আহ্ রহিত হয়ে গিয়েছে।"[১৮৫]

মুত'আহ্ বিয়ে খাইবারের যুদ্ধের সময়, নাকি মক্কা বিজয়ের সময় নিষিদ্ধ হয়েছিল তা নিয়ে 'আলিমদের মাঝে মতপার্থক্য আছে। দ্বিতীয় মতটিকে অধিক শক্তিশালী বলে মনে হয় এবং অধিকাংশ উলামা এই মতটিকেই গ্রহণ করেছেন। সাবরাহ ইবনু মা'বাদ ﷺ বর্ণনা করেন, মক্কা বিজয়ের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

---

[১৮৪] হাদীসটি আবু দাউদ এবং আল-বায়হাকিসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৭৪৭৯ এবং ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৮৭)।

[১৮৫] হাদীসটি ইবনু হিব্বান, আদ-দারাকুতনি এবং আল-বায়হাকি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৭০২২ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ২৪০২)।

> “হে লোকেরা! ইতিপূর্বে আমি তোমাদেরকে মুত‘আহ্ -এর মাধ্যমে নারীদের গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছিলাম। তবে নিশ্চয়ই এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ মুত‘আহ-কে নিষিদ্ধ করেছেন। অতএব যদি কারও এমন স্ত্রী থাকে, তা হলে তাকে মুক্ত করে দাও এবং তাদের যা দিয়েছো তার কিছুই তাদের থেকে ফিরিয়ে নিয়ো না।”[১৮৬]

সাব্‌রাহ ﷺ আরও বর্ণনা করেন:

> “বিজয়ের বছর আমরা যখন মক্কায় প্রবেশ করছিলাম, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে (মুত‘আহ্’র মাধ্যমে) সহবাসের অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি তা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দেন– এমনকি আমরা মক্কা ত্যাগ করার পূর্বেই।”[১৮৭]

হিল্লে বিয়ে

কোনো স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তিনবার তালাক দিয়ে দেয়, তা হলে সে ওই স্ত্রীকে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না, যদি না সেই নারীর অন্য কোনো পুরুষের সাথে বিয়ে হয়[১৮৮] এবং তার দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দেয়।

প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় বিয়ে বৈধ হওয়ার পূর্বে অবশ্যই দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সেই নারীর শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে হবে, এবং দ্বিতীয় স্বামী তাকে স্বেচ্ছায় তালাক দেবে।

ইবনু ‘উমার বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নিকট একটি মকদ্দমা পেশ করা হলো যা এরূপ:

“এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিনবার তালাক দিলো। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি তাকে বিয়ে করল, দরজা বন্ধ করল, পর্দা ফেলে দিলো (অর্থাৎ সে তার সাথে সম্পূর্ণ একাকী সময় কাটালো)। কিন্তু যৌনমিলন না করেই তাকে তালাক দিয়ে দিলো। এতে কি সে তার প্রথম স্বামীর জন্য বৈধ হবে?” তিনি ﷺ উত্তর দিলেন:

> “সে প্রথম জনের (প্রথম স্বামীর) জন্য বৈধ হবে না, যতক্ষণ না দ্বিতীয় জন তার সাথে সহবাস করবে।”[১৮৯]

---

[১৮৬] হাদীসটি মুসলিম এবং ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন।

[১৮৭] হাদীসটি মুসলিম, আহ্‌মাদ এবং আল-বায়হাকি সংকলন করেছেন।

[১৮৮] সূরা আল বাকারাহ; ২:২৩০

[১৮৯] হাদীসটি আন-নাসা‘ঈ এবং আহ্‌মাদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৭২৫৩ এবং ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং

একই মর্মে, 'আইশাহ, আনাস এবং 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ বর্ণনা করেন, রুফা'আহ্ আল-কার্‌যি তার স্ত্রীকে তিনবার তালাক দেয়। এরপর তার স্ত্রী 'আব্দুর রাহমান ইবনু আয-যুবায়েরকে বিয়ে করে। কিন্তু তাকে কাছে আসতে না দিয়েই নবিজি ﷺ এর নিকট দাবি করল, তার দ্বিতীয় স্বামী নপুংসক এবং তাকে তালাক দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালো। আব্দুর রাহমান ওই মহিলার দাবিকে এই বলে খণ্ডন করল, সে আসলে তার প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায়। অতঃপর আল্লাহর রাসূল ﷺ সেই মহিলাকে বললেন, এমনটি হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস করেছে।[১৯০]

উল্লিখিত বিপত্তি এড়ানোর জন্য কিছু লোক ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয় যাতে নারী তার পূর্বের স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারে। এর অংশ হিসেবে কোনো লোক (মুহিল অথবা মুহাল্লিল) তাকে বিয়ে করবে এবং বিয়ের চুক্তিনামাতেই একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হবে, যেই মুহূর্তে দ্বিতীয় স্বামী সেই নারীর সাথে সহবাস করবে সেই মুহূর্তেই তাদের বিয়ে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এটাও একধরনের মুত'আহ বিয়ে। কারণ,, এর মধ্যে সাময়িক চুক্তির মতো একটি ব্যাপার রয়েছে। এর চেয়েও বড় কথা হলো, এতে আল্লাহর হুকুম এবং নির্দেশনার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ এবং আল্লাহর বিধান নিয়ে ছলচাতুরী প্রকাশ পায়। এ কারণেই এ ধরনের কাজ আল্লাহর অভিসম্পাতের যোগ্য।

'আলী ইবনু 'আবি তলিব, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ এবং জাবির ইবনু 'আব্দিল্লাহ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে তাহলীহ করে আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন এবং যার জন্য করা হয় তাকেও।"[১৯১]

'উকবাহ ইবনু 'আমির ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

১৮৮৭)।

[১৯০] হাদীসটি আল বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। হাদীসটির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার জন্য ইরওয়া আল-গালীল এর হাদীস নং ১৯৯৭ দেখুন।

[১৯১] হাদীসটি আহমাদ এবং আন-নাসা'ঈসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৮৯৭ এবং সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫১০১)।

> “আমি কি তোমাদেরকে ওই ভাড়াটে পাঁঠার কথা বলবো না? এ হলো সেই ব্যক্তি যে তাহলীল করে। যে তাহলীল করে এবং যার জন্য করা হয়, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দিন।”[১৯২]

নাফি’ বর্ণনা করেন, এক লোক ইবনু ‘উমার ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিল, “কোনো মহিলাকে তার (পূর্বের) স্বামীর জন্য বৈধ করতে আমি কি তাকে বিয়ে করতে পারি, যদিও সে (পূর্বের স্বামী) আমাকে এমনটি করতে বলেনি এবং আমি তার অজান্তেই এমনটি করি?” তিনি উত্তরে বলেছিলেন:

> “না! বিয়ে হতে হবে শুধু সৎ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে; তুমি তাকে পছন্দ করলে, তাকে রেখে দাও। আর তুমি তাকে অপছন্দ করলে, তাকে তালাক দিয়ে দাও। বস্তুত, রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় আমরা একে (তাহলিল) যিনা বলেই বিবেচনা করতাম। আর যারা তাকে (নারীকে) অন্য পুরুষের জন্য বৈধ করতে এমনটি করে, তারা যিনার মধ্যেই থেকে যাবে। এমনকি যদিও তারা ২০ বছর একসাথেই বসবাস করে।”[১৯৩]

শিগার বিয়ে

শিগার এক ধরনের আন্তঃবিয়ে পদ্ধতি যেখানে দুজন লোক পরস্পর পরস্পরের কন্যা বা তাদের অধীনস্থ নারীদেরকে বিয়ে করবে এবং তাদের কেউই স্ত্রীদেরকে মোহর দেবে না। নাফি‘ ﷺ এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

> “শিগার হলো এমন, একজন লোক অন্য একজন লোকের সাথে নিজের কন্যার বিয়ে দেবে এই শর্তে, ওই লোকও পূর্বজনের সাথে তার কন্যার বিয়ে দেবে। এবং তাদেরকে কোনো মোহর দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না।”[১৯৪]

ইবনু ‘উমার ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ শিগার বিয়ে নিষিদ্ধ করেছেন[১৯৫] এবং বলেছেন:

---

[১৯২] হাদীসটি ইবনু মাজাহ, আল-হাকিম এবং আল-বায়হাকি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি হাসান বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ২৫৯৬ এবং সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ১৮৯৭)।

[১৯৩] হাদীসটি আল-হাকিম, আল-বায়হাকি এবং আত-তাবারানি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি হাসান বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৮৯৮)।

[১৯৪] হাদীসটি আল বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[১৯৫] হাদীসটি আল বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

> “ইসলামে শিগার বলতে কিছু নেই।”[১৯৬]

এমনকি এ ধরনের বিবাহে মোহর নির্ধারণ করা হলেও সন্দেহের একটি উৎস হিসেবে থেকেই যায়। কাজেই তা পরিত্যাজ্য।

আল আ'রাজ বর্ণনা করেন, আল আব্বাস ইবনু 'আব্দিল্লাহ ইবনু 'আব্বাস তার মেয়েকে 'আব্দুর রাহ্মান ইবনু আল-হাকামের সাথে বিয়ে দেন এবং আব্দুর রাহ্মানও তার মেয়েকে পূর্বজনের সাথে বিয়ে দেন এবং তারা কিছু মোহর নির্ধারণ করেন। তথাপি, তৎকালীন খালিফা মু'আবিয়া ﷺ মারওয়ান ইবনু আল-হাকামকে চিঠি লিখে নির্দেশ দেন তিনি যেন তাদের মাঝে বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেন এবং তিনি চিঠিতে আরও বলেন:

> “এটিই হলো শিগার বিয়ে, যা আল্লাহর রাসূল ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন।”[১৯৭]

তালাক দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে বিয়ে করা

কিছু লোক বিশেষ কিছু স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নারীদেরকে বিয়ে করে থাকে। তাদের মনে উদ্দেশ্যই থাকে স্বার্থ সিদ্ধির পর ওই নারীকে তালাক দিয়ে দেওয়া। এর একটি সচরাচর দৃষ্টান্ত পশ্চিমা দেশগুলোতে দেখা যায় যেখানে একজন ভিনদেশি পুরুষ কোনো দেশের নাগরিকত্ব প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ওই দেশেরই কোনো মহিলাকে বিয়ে করে; এবং তার পরিকল্পনা থাকে লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেলেই ওই মহিলাকে তালাক দিয়ে দেওয়া।

এই ধরনের বিয়ের ক্ষেত্রে চুক্তিনামায় যদি শর্ত হিসেবে এমনটি উল্লেখ করাই থাকে, তা হলে তা হবে এক ধরনের মুত'আহ বিয়ে; যা নিষিদ্ধ। আর যদি উল্লেখ না থাকে, তা হলে অধিকাংশ 'আলিম এই ধরনের বিয়েকে বৈধ বলে গণ্য করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে পুরুষ পাপী হবে। কারণ, সে তার নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্যেকে ওই মহিলার কাছে গোপন করে তাকে প্রতারিত করেছে।

---

[১৯৬] হাদীসটি মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[১৯৭] হাদীসটি আহ্মাদ,আবু দাউদ এবং ইবনু হিব্বান সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি হাসান বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৭২৫৩ এবং ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৮৯৬)।

অমুসলিমদেরকে বিয়ে করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুশরিক পৌত্তলিক নারী-পুরুষদের সাথে মুসলিমদের বিয়ে নিষিদ্ধ করেছেন:

﴿ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

« এবং মুশরিক নারীদেরকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিয়ে কোরো না। এবং নিশ্চয়ই মু'মিন ক্রীতদাসী মুশরিক (স্বাধীন) মহিলা অপেক্ষা উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে ফেলে। মুশরিক পুরুষরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তাদের সাথে (মুসলিম নারীদের) বিয়ে দিও না এবং নিশ্চয়ই মুশরিক পুরুষরা তোমাদের পছন্দনীয় হলেও মু'মিন ক্রীতদাস তার চেয়ে উত্তম। এরাই জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানবমণ্ডলীর জন্য স্বীয় নির্দেশনাবলি সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে।[১৯৮] »

প্রত্যেক অমুসলিমই হলো মুশরিক। আহলে কিতাবরাও (ইহুদি এবং খ্রিষ্টান) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যদি তারা আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কারও ('ঈসা বা 'উযাইর) ইবাদত করে কিংবা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উল্লিখিত বিধানের ব্যতিক্রম সৃষ্টি হিসেবে মুসলিম পুরুষদেরকে ইহুদি ও খ্রিষ্টান নারীদের বিয়ে করার অনুমতি প্রদান করেছেন। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, তাদেরকে অবশ্যই সতী হতে হবে। অর্থাৎ তাদেরকে এমন হতে হবে যারা পূর্বে কখনো কোনো পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ

[১৯৮] সূরা আল-বাকারাহ, ২:২২১।

إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

« আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুগুলো হালাল করা হয়েছে; আর আহলে কিতাবদের জবেহকৃত জীবও তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের জবেহকৃত জীবও তাদের জন্য হালাল। আর সতী-সাধ্বী মুসলিম নারীরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের মধ্যকার সতী-সাধ্বী নারীরাও (তোমাদের জন্য হালাল), যদি তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান করো তোমাদের পত্নীরূপে গ্রহণ করার জন্য, প্রকাশ্যে ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নয়। আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী করে তার আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং সে পরকালে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[১৯৯] »

'আহলে কিতাব' নারীদের সাথে বিয়ের ব্যাপারে সতর্কতা

কিছু সাহাবায়ে কেরামের মতে, উল্লিখিত অনুমতি কেবল ওই সকল আহলে কিতাবদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা একত্ববাদী। ত্রিত্ববাদী নারীদের ব্যাপারে তাদের যুক্তি হলো, 'এর চেয়ে জঘন্য শির্‌ক আর কী হতে পারে, যে (নারী) দাবি করে 'ঈসা তার প্রতিপালক?' উদাহরণস্বরূপ, 'আলী ﷺ বলেছেন:

> "আরব খ্রিষ্টানদের জবাই করা (জন্তু) খাওয়া যাবে না, কারণ, তারা (প্রকৃত) খ্রিস্টবাদকে ধারণ করে না। এ ছাড়া তারা মদ্যপানকারী।"[২০০]

অন্যদিকে, 'উমারকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ওই সকল ইহুদিদের জবেহকৃত গোশত খাওয়া বৈধ কি না যারা তাওরাত পাঠ করে, সাব্‌ত পালন করে কিন্তু পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না। উত্তরে তিনি বলেন:

> "তারা আহলে কিতাবদের একটি দল।"[২০১]

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন:

---

[১৯৯] সূরা আল-মায়েদা, ৫:৫।

[২০০] বর্ণনাটি 'আব্দুর রায্‌যাক এবং আল-বায়হাকি কর্তৃক সংকলিত। মুস্তাফা আল-'আদাওবি এটিকে সহীহ বলে সত্যায়ন করেছেন। (জামি'উ আহ্‌কামিন নিসা, ৩:১২৫)।

[২০১] বর্ণনাটি 'আব্দুর রায্‌যাক এবং আল-বায়হাকি কর্তৃক সংকলিত। মুস্তাফা আল-'আদাওবি এটিকে সহীহ বলে সত্যায়ন করেছেন। (জামি'উ আহ্‌কামিন নিসা, ৩:১২৬)।

> "তাগলিবদের [২০২] জবাই করা (জন্তুর গোশত) খাও এবং তাদের নারীদেরকে বিয়ে করো।" [২০৩]

আয-যুহরি ﷺ-কে আরবের খ্রিষ্টানদের জবাইকৃত গোশত খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তর দেন, তা বৈধ এবং বলেন:

> "যে যেই ধর্মকে গ্রহণ করল সে সেই ধর্মের অনুসারীদের একজন বলে বিবেচিত।" [২০৪]

একই প্রশ্নের উত্তরে আশ-শা'বি ﷺ উত্তর হলো:

> "আল্লাহ তাদের জবাই করা (জন্তুর গোশত) হালাল করেছেন এবং তোমাদের প্রতিপালক ভুলে যান না।" [২০৫]

সালাফদের থেকে এই ধরনের আরও অনেক বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে যেগুলোর বক্তব্য অনুযায়ী ইহুদি এবং খ্রিষ্টানরাই হলো 'আহলে কিতাব', তাদের বিশ্বাস যে ধরনেরই হোক না কেন। দুটি মতের মধ্যে এই মতটিকেই অধিক শক্তিশালী বলে মনে হয়। [২০৬]

একটি কঠিন শর্ত

'সতীত্ব' শর্তটি আমাদের সময়ে সচরাচর খাটে না। সতী হলো সেই নারী যে গৃহাভ্যন্তরে অমূল্য মুক্তোর মতো সযত্নে সুরক্ষিত থেকেছে। স্বামী ছাড়া পরপুরুষ যাকে কখনো চুম্বন করেনি, ছুঁয়ে দেখেনি, তার গায়ে হাত লাগায়নি; স্বামী ছাড়া যে কখনো অন্য পুরুষদের সাথে যৌনতায় জড়ায়নি।

একজন অমুসলিম নারীর এ ধরনের বিশ্বাস নেই যা তাকে এসব পাপ কাজ থেকে বাধা দেবে। উপরন্তু, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনের উৎসাহ আর অনুমতিক্রমে আজকের নগ্ন পশ্চিমা সংস্কৃতিতে বিয়ে না করেও শারীরিক সম্পর্ক বৈধ। কেবল বয়ঃসন্ধি

---

[২০২] আরবের একটি খ্রিষ্টান উপজাতি।

[২০৩] বর্ণনাটি ইবনু আবি শাইবাহ কর্তৃক সংকলিত। মুস্তাফা আল-'আদাওবি এটিকে সহীহ বলে সত্যায়ন করেছেন। (জামি'উ আহকামিন নিসা, ৩:১২৬)।

[২০৪] বর্ণনাটি 'আব্দুর রাযযাক কর্তৃক সংকলিত। মুস্তাফা আল-'আদাওবি এটিকে সহীহ বলে সত্যায়ন করেছেন। (জামি'উ আহকামিন নিসা, ৩:১২৭)।

[২০৫] বর্ণনাটি 'আব্দুর রাযযাক কর্তৃক সংকলিত। মুস্তাফা আল-'আদাওবি এটিকে সহীহ বলে সত্যায়ন করেছেন। (জামি'উ আহকামিন নিসা, ৩:১২৭)।

[২০৬] জামি'উ আহকামিন নিসা, ৩:১২২-১২৮ দেখুন।

পেরিয়েছে কিন্তু এখনো যৌন সম্পর্কে জড়ায়নি এমন মেয়ে খুঁজে পাওয়া বড়ই দুষ্কর। পশ্চিমাদের মাঝে কুমারীত্ব খুঁজে পাওয়া এখন অলীক স্বপ্ন।

কেউ হয়তো জানতে চাইবেন, 'কোনো খ্রিষ্টান নারী যদি তার অতীতের উচ্ছৃঙ্খল যৌনাচারের ব্যাপারে তাওবা করে, তা হলে কি তাকে বিয়ে করা বৈধ হবে?' উত্তর হলো—তাওবা করা একটি ইবাদত-কর্ম যা কেবল মুসলিমদের জন্য নির্ধারিত। তাওবার প্রথম শর্তই হলো, আল্লাহর প্রতি অকপট, বিশুদ্ধ অন্তর থেকে বিশ্বাস। কীভাবে একজন অমুসলিম এই শর্ত পূরণ করবে? কাজেই, তার তাওবা করার একমাত্র পথ হলো প্রথমেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মনে-প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করা।

এমনকি ইসলামের প্রভাব আর যশ যখন স্বর্ণশিখরে, তখনো 'উমার ﵁ আহ্‌লে কিতাবদের বিয়ে করার বিরুদ্ধে ছিলেন। আবু ওয়া'লি বর্ণনা করেন, হুযাইফাহ্ ﵁ এক ইহুদি নারীকে বিয়ে করেছিলেন। এতে 'উমার ﵁ তাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেন, "তাকে তালাক দিয়ে দিন।" প্রত্যুত্তরে হুযাইফাহ্ ﵁ লেখেন, "যদি এটি (আমার বিয়ে) অবৈধ হয়, তা হলে আমি তাকে তালাক দিয়ে দেবো।" 'উমার লিখে জানান,

> "আমি অবশ্যই ধারণা করি না, তা অবৈধ। তবে আমার ভয় হচ্ছে, আপনারা (মুসলিমরা) শিগগিরই তাদের অসতী নারীদেরকে গ্রহণ করবেন (যদি প্রত্যেকেই ব্যাপারটি এত হালকাভাবে গ্রহণ করতে থাকে)।"[২০৭]

ইহুদি এবং খ্রিষ্টান নারীদেরকে বিয়ে করা সম্পর্কে জাবিরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তরে বলেছিলেন:

> "আমরা যখন সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের ﵁ সাথে কুফায় অবস্থানরত ছিলাম তখন তাদের বিয়ে করতাম। কারণ, তখন আমরা কোনো মুসলিম নারী খুঁজে পাইনি বললেই চলে। তবে (যুদ্ধ থেকে) ফিরে এসে তাদেরকে তালাক দিয়ে দিয়েছিলাম।"[২০৮]

আজকের দিনে আমাদের মুসলিম ভাইয়েরা বড়ই শক্তিহীন। নিজ দেশেই তারা আজ পরাভূত। কোনো মুসলিম পুরুষ অমুসলিম কোনো নারীকে বিয়ে করলে নিজের ঘরেই সে ইসলামী পরিবেশ রক্ষা করতে সক্ষম হবে না। নিজের চোখে তাকে তাকিয়ে দেখতে হবে তার স্ত্রী 'ক্রস' পরিধান করে আছে, যিশুখ্রিষ্টের কাছে প্রার্থনা করছে,

---

[২০৭] বর্ণনাটি আল-বায়হাকি এবং সা'আদ ইবনু মানসুর কর্তৃক সংকলিত। মুস্তাফা আল-'আদাওবি এটিকে সহীহ বলে সত্যায়ন করেছেন। (জামি'উ আহ্‌কামিন নিসা, ৩:১২২)।

[২০৮] বর্ণনাটি আশ-শিলৃ (আল-উম্মু গ্রন্থে) এবং আল-বায়হাকি কর্তৃক সংকলিত। মুস্তাফা আল-'আদাওবি এটিকে সহীহ বলে সত্যায়ন করেছেন। (জামি'উ আহ্‌কামিন নিসা, ৩:১২৪)।

শূকর খাচ্ছে এবং তার ঔরসজাত সন্তানদের কাফের হিসেবে বড় করে তুলছে। এমন নজির সমাজে আজ বহু দেখা যায়। এই ব্যাপারটিই আল্লাহর হুকুমের একটি বিরুদ্ধাচরণ, যেমনটি প্রযোজ্য তার নিজের জন্য, ঠিক তেমনিভাবে তার সন্তানদের জন্যও। এই পাপের চেয়ে বড় পাপ আর কী হতে পারে? এমনটি যারা করেছে, আল্লাহর জমিনে তাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে হতে পারে! শুধু এটিই বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো অমুসলিম নারীর সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ হওয়ার যুক্তিযুক্ত একটি কারণ,।

অতএব মুসলিম যুবকদের উচিত আল্লাহকে ভয় করে চলা এবং শুধু মুসলিম নারীদেরকেই বিয়ে করা—পার্থিব জীবনে যারা হবে উত্তম সঙ্গিনী এবং যারা সন্তানদের বড় করে তুলবে ইসলামের আদর্শে।

স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

ইসলামে স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকারগুলো সুনির্ধারিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। 'উসমান ইবনু মায'উন[২০৯] এবং আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর[২১০] সহ আরও অনেক সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায়, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

> "তোমার ওপর রয়েছে তোমার স্ত্রীর অধিকার"[২১১]

'আমর ইবনুল আস[২১২] ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "মনে রেখো! তোমাদের নারীদের ওপর রয়েছে তোমাদের অধিকার এবং তোমাদের ওপর রয়েছে তোমাদের নারীদের অধিকার।"[২১৩]

স্ত্রীর অধিকার পূর্ণ করা তাক্ওয়ার বহিঃপ্রকাশ; আর তাক্ওয়া হলো আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করা। স্ত্রীর অধিকার মানুষ এবং আল্লাহর মাঝে একটি চুক্তি। তিনি মানুষকে এই চুক্তির ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। জাবির ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "তোমাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। বস্তুত তোমরা আল্লাহর আমানাহ হিসেবে তাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর বাণীর (অনুমতির) মাধ্যমে তাদের

---

[২০৯] হাদীসটি আহ্মাদ এবং আবু দাউদ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ২০১৫)।

[২১০] সম্পূর্ণ হাদীসটি এই মডিউলের পরবর্তী অংশে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

[২১১] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[২১২] সম্পূর্ণ হাদীসটি ৯ নং মডিউলের ৫ নং পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করা হয়েছে।

[২১৩] হাদীসটি আত-তিরমিযি, আন-নাসা'ঈ এবং ইবনু মাজাহ্ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি হাসান বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৭৮৮০ এবং ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ২০৩০)।

> লজ্জাস্থান উপভোগ করার অধিকার পেয়েছ। তোমাদের ওপর তাদের অধিকার আছে—নিয়মানুযায়ী তোমরা তাদেরকে খোরপোশ দেবে।"[২১৪]

তার অধিকারসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এবং ন্যায়সংগত পন্থায় অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। নারীর অধিকার পূর্ণ করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এই অধিকার রক্ষায় অবহেলা করা শারীয়াহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ যা পরিবার তথা মুসলিম সমাজের সামগ্রিক কল্যাণকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়।

ইসলাম নারীকে পূর্ণ মালিকানার অধিকার দিয়েছে। স্ত্রীর অনুমতি না নিয়ে, তার মালিকানাধীন (নিজের উপার্জিত, উত্তরাধিকার, মোহর, উপহার কিংবা যেকোনো সূত্রে প্রাপ্ত অর্থকড়ি, স্বর্ণালংকার, মোহরের অর্থ, পোশাক-আশাক ইত্যাদিসহ) কোনোকিছুই নিয়ে নেওয়ার অধিকার স্বামীর নেই। তবে স্বামী যেহেতু পরিবারের প্রধান কর্তা এবং স্ত্রী তার অধীনস্থ, তাই সংসারে সুশৃঙ্খল এবং সম্প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে স্বামীর কতৃত্বাধীন ক্ষেত্রে স্ত্রীর নিজের অর্থ ব্যয়ের ওপর কিছু বিধিনিষেধ রাখা হয়েছে।

স্বামীর ইচ্ছার তোয়াক্কা না করে যদি নিজের ইচ্ছেমতো অর্থ ব্যয় করার স্বাধীনতা নারীর থাকত, তা হলে মুহূর্তেই সংসারে কলহ বেধে যেত। কারণ, স্ত্রী এমন অনেক ক্ষেত্রেই খরচ করতে চাইতো, যা সংসারের নীতিনির্ধারক হিসেবে স্বামীর সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো না। ফলে সংসারে স্বামীর কর্তৃত্ব খর্ব হতো। ছোট্ট একটি উদাহরণ হলো—স্বামী হয়তো কিশোর বয়সী ছেলেকে গাড়ি বা মোটরবাইক কিনে দেবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন এই সিদ্ধান্তের বিপরীতে গিয়ে স্ত্রী হয়তো বলতে পারে, 'আমার নিজের টাকা দিয়েই আমি ওকে একটা গাড়ি কিনে দেবো।'

এ কারণেই অসীম প্রজ্ঞাময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হুকুম দিয়েছেন, স্বামীর অনুমতি অথবা সম্মতি ছাড়া স্ত্রী তার নিজের অর্থও খরচ করতে পারবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর এবং কা'আব ইবনু মালিক ﵄ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "কোনো নারীর জন্য (স্বাধীনভাবে) তার অর্থ খরচ করা অনুমোদিত নয়—যখন (বিয়ের মাধ্যমে) স্বামী তার (স্ত্রীর) অভিভাবকত্ব লাভ করে।"[২১৫]

---

[২১৪] হাদীসটি নবীর ﷺ হাজ্জব্রত পালনের বর্ণনা-সম্বলিত জাবির থেকে বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসের অংশবিশেষ যা মুসলিম এবং আবু দাউদ সংকলন করেছেন।

[২১৫] হাদীসটি আবু দাউদ এবং আল-হাকিম সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে

ওয়াসিলাহ্ ؓ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "স্বামীর অনুমতি না নিয়ে নিজের অর্থ ব্যয় করা কোনো নারীর জন্য অনুমোদিত নয়।" [২১৬]

মোহর

স্বামীর ওপর স্ত্রীর প্রথম অর্থনৈতিক অধিকার হলো মোহর। বিয়ের চুক্তিনামা সম্পাদিত হওয়ার সাথে সাথেই তা আদায়যোগ্য হয়ে যায়।

তত্ত্বাবধায়ন: পুরুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

মানবজীবনে সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার গুরুত্ব অপরিসীম। দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাচ্ছন্দ্যে ও স্বাভাবিকভাবে সম্পাদনের জন্য ব্যক্তির মনে নিরাপত্তাবোধ থাকা প্রয়োজন।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সাধারণত স্ত্রীই তুলনামূলকভাবে নাজুক ও দুর্বল এবং নিরাপত্তার জন্য তাকে স্বামীর মুখাপেক্ষী হতে হয়। কাজেই স্বামীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর অন্যতম একটি হলো স্ত্রীর নিরাপত্তা বিধান করা। পরিবারের কর্তা হিসেবে এটি স্বামীর দায়িত্বের একটি অংশ:

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾

« পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে, আল্লাহ তাদের একজনের ওপর অন্যজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। [২১৭] »

উল্লিখিত আয়াত অনুযায়ী, কিছু নির্দিষ্ট গুণাবলির কারণে আল্লাহ পুরুষকে নেতৃত্ব (বা কাওয়ামাহ্) দান করেছেন, যে গুণাবলির কারণে সে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম। একজন নেতার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গুণ হলো তার অনুসারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাদের জন্য নিরাপদ ও সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা।

মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৭৬২৫ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৮২৫)।

[২১৬] হাদীসটি আত-তাবারানি (আল-কাবির গ্রন্থে) এবং অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫৪২৪ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৭৭৫)।

[২১৭] আন-নিসা, ৪:৩৪

এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা শারীরিক এবং মানসিক নিরাপত্তাসহ অন্য সব ধরনের কল্যাণকর নিরাপত্তাকে বোঝানো হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বামীকে তার স্ত্রীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা অনিবার্য। পরবর্তী অংশে নিরাপত্তার মধ্যে কী কী অন্তর্ভুক্ত তা নিয়ে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ভরণ-পোষণ

স্ত্রী এবং পরিবার-পরিজনের প্রতি স্বামীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো তাদের আর্থিক ব্যয়ভার নির্বাহ করা। আর এই দায়িত্বের কারণেই আল্লাহ পুরুষকে পরিবারের প্রধান কর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন:

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾

« পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে, আল্লাহ তাদের একজনের ওপর অন্যজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে।[২১৮] »

জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, যে হাদীসটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "তোমাদের ওপর তাদের (তোমাদের নারীদের) অধিকার রয়েছে, তোমরা বিধি মোতাবেক তাদের জন্য খাবারের এবং পোশাকের ব্যবস্থা করবে।"[২১৯]

স্বামী যে আর্থিক ভরণ-পোষণ নির্বাহ করবে তা হবে তার আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

« আল্লাহ কোনো ব্যক্তির ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না।[২২০] »

---

[২১৮] আন-নিসা, ৪:৩৪

[২১৯] হাদীসটি মুসলিম এবং আবু দাউদ সংকলন করেছেন।

[২২০] আল-বাকারাহ, ২:২৮৬

নিজের সাধ্যে যা আছে তার চেয়ে বেশি কিছু দেওয়া স্বামীর জন্য জরুরি নয়। আবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কৃপণতা করা ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ সহযোগিতা না করাও তার জন্য অনুমোদিত নয়।

স্ত্রী এবং পরিবারের প্রতি আর্থিক দায়ভারকে স্বামীর অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়ার জন্য বৈধ সব পন্থা অবলম্বন না করেই অন্যের কাছে সাহায্যের জন্য হাত-পাতা তার উচিত নয়। আর্থিক সচ্ছলতা পরিবারের সকলের মনে নিরাপত্তা ও মর্যাদাবোধের জন্ম দেয়।

দুঃখ হয়, পাশ্চাত্যের অনেক মুসলিম পুরুষ, হয় আংশিক না হয় পুরোপুরিভাবে, সরকারি অর্থ-সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল থাকে। অথচ তাদের সামর্থ্য খাটিয়ে যা অর্জন করত তা দিয়েই ভালোমতো সংসার চলে যেত, যেমনটি উল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে। এর চেয়েও দুঃখজনক ব্যাপার হলো যখন দেখা যায়, কোনো লোক দুই বা ততোধিক নারীকে বিয়ে করে স্ত্রীদেরকে সরকারি আর্থিক সাহায্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিজে দায়িত্বহীনের মতো দিন কাটায়। অথচ স্বামী হিসেবে স্ত্রীদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করে না; বরং অনেক ক্ষেত্রে সরকারের কাছ থেকে পাওয়া আর্থিক সাহায্য স্ত্রীদের থেকে নিয়ে নিজে খরচ করে।

স্ত্রী এবং পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ চালানো স্বামীর ওপর কর্তব্য; আল্লাহর কাছে এই ব্যয় নির্বাহ করা তার জন্য সাদাকাহ্ বলে গণ্য হবে। স্ত্রী এবং পরিবার-পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ আর্থিক সংগতি নিশ্চিত করা পুরুষের প্রথম বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। এমনকি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার পূর্বেই তাকে এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আল্লাহ যখন তোমাদের কাউকে কোনো কল্যাণ (জীবিকা) দান করেন, তখন তার উচিত তা নিজের জন্য এবং তার পরিবারের সদস্যদের জন্য (খরচ) শুরু করা।" [২২১]

আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে দিনারটি তোমরা আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) ব্যয় করো, যে দিনারটি তোমরা দাস মুক্তির জন্য দান করো এবং যে দিনারটি তোমরা তোমাদের পরিবারের জন্য খরচ

[২২১] হাদীসটি মুসলিম এবং আহমাদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

করো—এগুলোর মধ্য থেকে সর্বাধিক পরিমাণ পুণ্য বয়ে আনে সেটি, যা তোমরা তোমাদের পরিবারের জন্য খরচ করো।"[২২২]

স্বামী যদি তার সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর চাহিদাসমূহ যথাযথভাবে পূরণ না করে, তা হলে স্ত্রী তার নিজের এবং সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ স্বামীর অনুমতি ছাড়াই তার উপার্জন থেকে নিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখে। স্ত্রী এবং নির্ভরশীলদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে অবহেলা করলে স্বামীর গুরুতর পাপ হবে। 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

"তোমার পাপের জন্য যথেষ্ট হলো—তাদেরকে (সাহায্য থেকে) বঞ্চিত করা যাদেরকে খাওয়ানোর দায়িত্ব তোমার।"[২২৩]

অন্য এক বর্ণনায় 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ؓ বর্ণনা করেন, নবিজি ﷺ বলেছেন:

"একজন মানুষের পাপের জন্য যথেষ্ট হলো—তাদেরকে অবহেলা করা যাদেরকে খাওয়ানোর দায়িত্ব তার"[২২৪]

অন্য এক বর্ণনায় মু'আবিয়া ইবনু হাইদাহ্ ؓ বলেছেন, তিনি নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, কোনো স্বামীর ওপর তার স্ত্রীর অধিকার কী?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন:

"(তোমার ওপর তার অধিকার হলো এই), যখন নিজে খাবে, তাকে খাওয়াবে; যখন নিজে পরবে, তাকে পরাবে; তার চেহারার প্রতি অসম্মান করবে না, তাকে আঘাত করবে না এবং ঘরের সীমানার বাইরে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করবে না। কীভাবে তা করবে, যেখানে তোমরা পরস্পরের সাথে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছ! তবে বৈধ কারণে হলে সেটা ভিন্ন।"[২২৫]

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেলেও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মা যদি সন্তানের দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করে, সেক্ষেত্রেও তার খোরপোশের ব্যবস্থা করা সন্তানের

---

[২২২] হাদীসটি মুসলিম সংকলন করেছেন।

[২২৩] হাদীসটি মুসলিম সংকলন করেছেন।

[২২৪] হাদীসটি আহ্মাদ, আবু দাউদ এবং ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি হাসান বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৪৪৮১ এবং ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ৮৯৪)।

[২২৫] হাদীসটি আহ্মাদ, আবু দাউদ এবং ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আবু দাউদ, হাদীস নং ১৮৭৫, ১৮৭৭ এবং ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ২০৩৩)।

পিতার ওপর কর্তব্য এবং এটা সন্তানের মায়ের অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মায়েদের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

« পিতার ওপর কর্তব্য—বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা।[২২৬] »

সংগতি অনুযায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করা

স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর জন্য একটি আদর্শ বাসগৃহের ব্যবস্থা করা স্ত্রীর প্রাপ্য অধিকার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾

« তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেখানে তোমরা বসবাস করো সেখানে তাদেরকেও বাস করতে দাও, তাদেরকে সঙ্কটে ফেলার জন্য কষ্ট দিয়ো না।[২২৭] »

আয়াতটি ইদ্দত পালনকারী তালাকপ্রাপ্ত নারীদের ক্ষেত্রে সরাসরি প্রযোজ্য হলেও তা ব্যাপক অর্থবোধক। এই নির্দেশ একজন পুরুষ কর্তার অধীনস্থ সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে অধীনস্থ স্ত্রীর এবং সন্তানদের ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য।

---

[২২৬] আল-বাকারাহ, ২:২৩৩।

[২২৭] আত-তালাক, ৬৫:৬।

স্ত্রীর অধিকার স্বামীর কর্তব্য

ধর্মগ্রন্থের বিশুদ্ধ শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীগুলোতে নারীকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। অনেক সমাজে তাকে শয়তানের সৃষ্ট এক অপবিত্র সত্তা বলে বিশ্বাস করা হতো। এমনকি এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিকৃত গ্রন্থগুলোতেও উল্লেখ ছিল।

অনুরূপভাবে, মধ্যযুগে নারীর অবস্থান ছিল অত্যন্ত অবমাননাকর। তাকে পিতা অথবা স্বামীর সম্পত্তির একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হতো; এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির মতো উত্তরাধিকার আইনানুযায়ী নারীকে হাতবদল করা হতো। আরবদের কাছে কন্যাশিশুর জন্মগ্রহণ করা ছিল এক অশুভ লক্ষণ। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই কন্যা শিশুকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলতো।

নারীর প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা শুধু আল্লাহর প্রেরিত আসমানি গ্রন্থসমূহেই প্রতিষ্ঠিত, যা যুগে যুগে আল্লাহ তাঁর রাসূলগণের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থগুলো আংশিক পরিবর্তিত, রহিত কিংবা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে 'ইসলাম' আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত এবং পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। এমন কোনো সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নেই যা ইসলামে আলোচিত হয়নি। ইসলাম এসে নারীর যথার্থ মর্যাদাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামে নারী কোনো নিচু প্রজাতির প্রাণী নয় যা পুরুষ সুযোগ পেলেই অপমান আর নির্যাতন করবে; বরং নারী হলো পুরুষেরই প্রতিচ্ছায়া। 'আইশাহ, আনাস এবং উম্মু সুলাইম ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নিশ্চয়ই নারীরা (সম্পর্কের দিক থেকে) পুরুষদের বোন।"[২২৮]

[২২৮] হাদীসটি আহমাদ এবং আবু দাউদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি হাসান বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৯৮৩, ২৩৩৩)।

নারীর অধিকারসমূহ আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং কেউ সেই অধিকারসমূহের লঙ্ঘন করতে পারবে না। আল- মিকদাম ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) তোমাদেরকে নারীদের প্রতি উত্তম আচরণের আদেশ করেছেন; তারা তো তোমাদের মাতা, কন্যা, এবং খালা...।"[২২৯]

নারীর শারীরিক দুর্বলতা কোনোভাবেই পুরুষকে নারীর অধিকার লঙ্ঘন করাকে সমর্থনযোগ্য করে না। আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আমি জোরালোভাবে তোমাদেরকে দুই দুর্বলের অধিকারের ব্যাপারে সতর্ক করছি— ইয়াতিম এবং নারী।"[২৩০]

স্ত্রীকে শাসনের অধিকার ও নিয়ম

স্ত্রীদেরকে শাসনের নিয়মের ব্যাপারে আল্লাহ কুর'আনে বলেছেন:

> « ...আর যে নারীদের মধ্যে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদেরকে (প্রথমে) উপদেশ দাও, (তাতে কাজ না হলে) বিছানায় তাদেরকে বর্জন করো এবং (তাতেও কোনো ফল না হলে) তাদেরকে হালকা আঘাত করো। এতে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তা হলে তাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনো পথ অন্বেষণ কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনেক উচ্চ, অনেক মহান।[২৩১] »

উল্লিখিত আয়াত থেকে আমরা দেখতে পাই, নিয়মানুবর্তিতার প্রথম পদক্ষেপ হলো উপদেশ দেওয়া। এই পদক্ষেপ সম্পন্ন না করে কেউ পরের পদক্ষেপ নিতে পারবে না। আর উপদেশ দিতে হবে আন্তরিকতার সাথে। যেন তা সৎকাজের আদেশ এবং মন্দকাজের নিষেধ করার শিষ্টাচারকে যথাযথভাবে অনুসরণ করার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

উপদেশ দিয়ে কাজ না হলে এবং স্ত্রী তার অবাধ্য আচরণ অব্যাহত রাখলে, স্বামী পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে পারে। আর তা হবে, স্ত্রীর বিছানা পরিত্যাগ করা। নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণের পথে এটি একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ যা স্বাভাবিকভাবেই

---

[২২৯] হাদীসটি আত-তাবারানি (তাঁর আল-কাবির গ্রন্থে) সংকলন করেছেন। আল-আলবানি প্রথম দিকে এটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করলেও পরবর্তী সময়ে হাদীসটিকে তিনি হাসান বলে বিবেচনা করেন যেমনটি যুহাইর আশ-শাওবিশ তাঁর দ্ব'ঈফুল জামে', হাদীস নং ১৭৬৩- তে উল্লেখ করেছেন।

[২৩০] হাদীসটি আহমাদ এবং ইবনু মাজাহ্‌সহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটি হাসান বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১০১৫ এবং সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৪৪৭)।

[২৩১] সূরাহ আন-নিসা' ৪:৩৪

স্ত্রীর আত্মসম্মানকে নাড়িয়ে দেবে এবং তার বোধোদয় ঘটাবে যে—নিজের অবাধ্য আচরণ এবং স্বেচ্ছাচারিতার কারণে স্বামী তার বিছানা এবং তার প্রতি মোহ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। মন্দ আচরণ ত্যাগ করে স্বামীর কথা মেনে নেওয়া এবং সেই অনুযায়ী চলার জন্য এই পদক্ষেপই স্ত্রীর জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত।

সূরা আন-নিসার (৪:৩৪) উল্লিখিত আয়াতে আমরা যেমনটি দেখেছি তাতে—স্ত্রী যদি প্রথম দুই পদক্ষেপের মাধ্যমে সংশোধিত না হয় এবং তার অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতা বজায় রাখে, তা হলে স্বামী তাকে আঘাত করতে পারে।

তবে আঘাতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে—আঘাত কষ্টদায়ক হওয়া যাবে না, শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন ফেলা যাবে না এবং মুখমণ্ডলে, মাথায় এবং তলপেটে আঘাত করা যাবে না। 'আমর ইবনুল-আহওয়াস জুশামি ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "মনে রেখো! নারীদের সাথে তোমরা উত্তম আচরণ করবে, কারণ, তারা তোমাদের দায়িত্বাধীন; এবং অকারণে তাদের ওপর বেশি খবরদারি করবে না, যতক্ষণ না তারা কোনো সুস্পষ্ট পাপকাজে লিপ্ত হয়। যদি তারা তা করে, তবে তাদের বিছানা ত্যাগ করো, এবং তাদেরকে হালকাভাবে আঘাত করো। যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে, এরপর আর কোনো শাস্তি প্রয়োগ কোরো না।"[২৩২]

'আতা (র.) বর্ণনা করেন, তিনি ইবনু 'আব্বাসকে ﷺ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হালকা আঘাত কী?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "মিসওয়াক[২৩৩] বা সে রকম কিছু দিয়ে আঘাত করা।"[২৩৪]

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, 'এই হালকা আঘাত করে লাভটা কী?' উত্তর হলো, নারীরা সচরাচর সংবেদনশীল প্রকৃতির হয়ে থাকে; নারীর প্রতি সামান্যতম অশ্রদ্ধাসূচক আচরণও তাকে ভয়ানকভাবে আলোড়িত করবে এবং নিজের আচার-আচরণকে সে পুনর্বিবেচনা করতে সচেষ্ট হবে। আর হালকা আঘাতে যদি কাজ না হয়,

---

[২৩২] হাদীসটি আত-তিরমিযি, আন নাসা'ঈ এবং ইবনু মাজাহ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (সাহীহুল জামে', হাদীস নং ৭৮৮০ এবং ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ২০৩০)

[২৩৩] সিওয়াক অথবা মিসওয়াক। 'আরাক' নামক একটি মরুবৃক্ষের মূল থেকে কেটে নেওয়া (সাধারণত ৬ ইঞ্চি বা ২০ সেমি. দীর্ঘ) একখণ্ড চিকন ও ছোট্ট লাঠির মতো দণ্ড যা দন্ত পরিষ্কারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

[২৩৪] আল-কুরতুবি-র 'আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন' ৫:১৭২।

তা হলে নির্দয় পিটুনি দিয়েও কোনো কাজ হবে না। ভুলে গেলে চলবে না, এই আঘাত করার উদ্দেশ্য হলো তাকে তার ভুল স্মরণ করিয়ে দেওয়া, যাতে সে সংশোধিত হতে পারে। এর উদ্দেশ্য কখনোই প্রতিশোধ নেওয়া বা তার ক্ষতি করা নয়।

কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে প্রহার করার অনুমতি থাকলেও, স্ত্রীকে প্রহার করার বিষয়টি ইসলামে অপছন্দনীয়; এবং এটিকে একটি নিরুপায় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আইয়াস ইবনু 'আব্দুল্লাহ আদ-দাওসি বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আল্লাহর দাসীদেরকে (অর্থাৎ নারীদেরকে) আঘাত কোরো না।"

নবিজি ﷺ আমাদের আদর্শ; যিনি কখনো তাঁর স্ত্রীদেরকে আঘাত করেননি। আইশাহ رضي الله عنها বর্ণনা করেন:

> "আল্লাহর রাসূল ﷺ কখনোই কোনো নারী, কাজের লোক বা অন্য কাউকে আঘাত করেননি, আল্লাহর দীনের জন্য যুদ্ধের সময় ছাড়া।"[২৩৫]

এটা মোটেই বোধগম্য নয়—স্ত্রীকে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করার পর কীভাবে একজন স্বামী প্রত্যাশা করে, সেই স্ত্রী তাকে মনোদৈহিক আনন্দ দেবে! 'আব্দুল্লাহ ইবনু যামা'আহ رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "কী করে তোমাদের কেউ স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে, উটকে কষাঘাত করার মতো তাকে কষাঘাত করে, আর তারপর দিনের শেষে তারই সাথে যৌনমিলনে রত হয়?"[২৩৬]

অনেক স্বামী তাদের স্ত্রীদের সাথে অন্যায় আচরণ করে। আবার সেই আচরণকে সমর্থনযোগ্য করার জন্য যেসব আয়াতে স্ত্রীকে স্বামীর অনুগত থাকার কথা বলা হয়েছে বা স্ত্রীকে নিয়মানুবর্তী রাখার জন্য স্বামীকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে সেগুলোর উদ্ধৃতি দেয়। অন্যায় আচরণকারী স্বামী মূলত একজন অত্যাচারী; এবং অত্যাচারীর ব্যাপারে আমরা যা-কিছু বলেছি, তার সবই এই ধরনের স্বামীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অধিকন্তু, অত্যাচারিত স্ত্রীর বিচারকের শরণাপন্ন হওয়ার এবং অত্যাচারী স্বামীর শাস্তি দাবি করার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।

---

[২৩৫] হাদীসটি মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[২৩৬] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

তালাক

আমরা পূর্বের অধ্যায়গুলোতে দেখলাম, নিয়মানুবর্তিতা চর্চার প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ ধাপ হলো সমঝোতার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে ফেলা। এতেও যদি কাজ না হয়, তা হলে তালাক ব্যতীত আর কিছু বাকি থাকে না। তালাক দেওয়া স্বামীর অধিকার। তবে সঠিকভাবে এবং স্বামীর জন্য বাধ্যতামূলক হলো এই যে—পারতপক্ষে এ কাজ নয়, কেবল যথার্থ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই এই অধিকার প্রয়োগ করবে।

একজন পুণ্যবতী সতী-সাধ্বী নারী যৌক্তিক ও বৈধ কোনো কারণ, ছাড়া কখনোই স্বামীর থেকে তালাক চাইবে না। যদি দেখা যায়, স্বামী প্রকৃত অর্থেই স্ত্রীর দীন-ধর্ম ও ঈমানের ক্ষতি করছে বা স্ত্রীর অকল্যাণ হয় এমন কিছু করছে—কেবল সেক্ষেত্রেই স্ত্রীর জন্য স্বামীর কাছে তালাক চাওয়ার অনুমতি আছে। নবিজি ﷺ নারীদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, তারা যেন বৈধ কোনো কারণ, ছাড়া তালাক না চায়। বিনা কারণে চাইলে তা হবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং এ জন্য তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সাওবান ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে নারী কোনো (বৈধ) কারণ, ছাড়াই তার স্বামীর থেকে তালাক চাইবে, জান্নাতের সুগন্ধ তার জন্য নিষিদ্ধ হয়ে যাবে।"[২৩৭]

স্বামীর কাছে তালাক চাওয়া অকৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। এতে স্ত্রীর ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব এবং কর্মপ্রচেষ্টা খাটো হয়ে যায়। এই ধরনের আচরণ মূলত স্বামীর মুখের ওপর চপেটাঘাত করা। কোনো বৈধ কারণ, ছাড়া এমনটি করা ইসলামে নিষিদ্ধ।

---

[২৩৭] হাদীসটি আহমাদ এবং আবু দাউদসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৭০৬ এবং ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ২০৩৫)।

স্বামীর অধিকার স্ত্রীর কর্তব্য

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বাভাবিক নিয়মেই পুরুষকে পরিবারের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করেছেন:

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾

« পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে, আল্লাহ তাদের একজনের ওপর অন্যজনকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাজতকারিণী ওই বিষয়ের, যা আল্লাহ হিফাজত করেছেন। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদেরকে সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদেরকে ত্যাগ করো এবং তাদেরকে (মৃদু) প্রহার করো। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে, তা হলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অনুসন্ধান কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত, মহান।[২৩৮] »

এই আয়াত সম্পর্কে ইমাম ইবনু কাসীর (র.) মন্তব্য করেছেন:

"পুরুষ হলো নারীর তত্ত্বাবধায়ক; সে নারীর রক্ষণাবেক্ষণকারী, প্রধান কার্যনির্বাহী, নারীকে নেতৃত্বদানকারী, এবং নারী কোনো ভুল করলে তার সংশোধনকারী।"

এর মাধ্যমে পুরুষের জন্য নির্ধারিত হয় পরিবার পরিচালনার এক গুরুদায়িত্ব। তার এই দায়িত্ব তাকে এনে দেয় বেশ কিছু অধিকার। স্ত্রীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উচিত পুরুষের এই অধিকার রক্ষা করে চলা। এটুকুই হলো নারীর ওপর

[২৩৮] আন-নিসা, ৪:৩৪।

পুরুষের বাড়তি প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব যা আল্লাহ পুরুষের জন্য নির্ধারিত করেছেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন:

﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

« আর নারীদের রয়েছে বিধি মোতাবেক অধিকার, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের অধিকার; আর পুরুষদের রয়েছে নারীদের ওপর মর্যাদা। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২৩৯] »

এটি অবশ্যই বুঝতে হবে, এই বাড়তি প্রাধান্যটুকু যতটা না সম্মান বা মর্যাদার কারণে তার চেয়ে বেশি দায়িত্বের কারণে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পুরুষের ওপর যে পবিত্র দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সত্যিকার অর্থেই সেই দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে একজন পুরুষ বাড়তি প্রাধান্যটুকু পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। আবার সেই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে সেই বাড়তি প্রাধান্যটুকু হারিয়ে ফেলে।

কেউ হয়তো ভাববেন, 'স্বামী এমন কোন মহান ব্যক্তিত্ব, যাকে সন্তুষ্ট করার জন্য স্ত্রীর এমন অসাধ্য সাধনের মতো কাজ করতে হবে?' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে আমাদেরকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বুঝতে হবে:

- স্বামীকে যে অধিকারগুলো দেওয়া হয়েছে, শান্তিপূর্ণভাবে এবং ফলপ্রসূ পন্থায় পরিবার পরিচালনার জন্য প্রকৃতপক্ষেই সেগুলো জরুরি।
- উল্লিখিত হাদীসটি সেই পুরুষ সম্পর্কে যে স্বামী হিসেবে এবং পরিবারের প্রধান কর্তা হিসেবে তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহ যথাযথভাবে পালন করে থাকে। সে প্রতি মুহূর্তেই তার স্ত্রী এবং সন্তানদেরকে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। তাদের নিরাপত্তা, সহযোগিতা এবং প্রতিপালনসহ অন্যান্য সকল বিষয়ে তার দায়িত্ব সুসম্পন্ন করে থাকে। এসবের যেকোনোটি পালন করতে গিয়ে অবহেলা করলে স্বামী সমানুপাতিক হারে তার স্ত্রীর ওপর থেকে অধিকার হারাবে।
- উল্লিখিত নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় স্বামী যখন স্ত্রীর প্রতি তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহ পালন করবে, তখন সে পরিবারের একজন সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে গণ্য হবে এবং স্ত্রীর পূর্ণ কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য এবং সহযোগিতা লাভের যোগ্য হবে।

---

[২৩৯] আল-বাকারাহ, ২:২২৮।

অতএব স্বামীর উল্লিখিত অধিকারসমূহের অর্থ এই নয়, তার কর্মকাণ্ড যেমনই হোক, সে তার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম। মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়েই আদম ﷺ-এর উত্তরসূরি। আর আদম ﷺ ছিলেন মাটি থেকে তৈরি। তাক্‌ওয়া এবং সৎকর্মশীলতার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় কে কার চেয়ে অধিক উত্তম। স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-সম্পর্ক এবং তাদের পরিবারের কল্যাণ ও সাফল্য নিশ্চিত করার জন্যই আল্লাহ্ স্বামীর অধিকারসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পরিবার-কাঠামোতে স্বামীর তুলনায় স্ত্রীর অবস্থান স্বাভাবিকভাবে অধস্তন পর্যায়ের হলেও, সৎকর্মশীলতার কারণে আল্লাহর দৃষ্টিতে স্ত্রী তার স্বামীর চেয়ে অনেক বেশি উত্তম হতে পারে। বিশেষ করে যখন স্ত্রী তার দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহ আল্লাহর পছন্দনীয় পন্থায় সুসম্পন্ন করে থাকে।

স্বামীর কর্তৃত্বের প্রতি অনুগত থাকা

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরিবারের দায়িত্ব এবং কর্তব্যসমূহকে পরিবারের মধ্যে বণ্টন করে দিয়েছেন এবং পুরুষকে পরিবারের প্রধান কর্তাব্যক্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। পুরুষের এই কর্তৃত্বকে নারী প্রত্যাখ্যান করতে বা এই ব্যাপারে কোনোরূপ প্রশ্ন তুলতে পারবে না; বরং আল্লাহর আদেশ মান্য করার জন্যই স্ত্রীকে স্বামীর কর্তৃত্বকে মেনে নিতে হবে। স্বামীর কর্তৃত্বের প্রতি তার আনুগত্যকে আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য হিসেবে ধরা হবে। তবে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যের মাত্রা যেন স্বামীকে সিজ্‌দা করার স্তরে পৌঁছে না যায়। 'আইশাহ্, আবু হুরায়রা, মু'আদ এবং বুরাইদাহ্ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আমি যদি কোনো মানুষকে অন্য কোনো মানুষের সামনে সিজ্‌দা করতে আদেশ করতাম, তা হলে আমি নারীকে তার স্বামীর সামনে সিজ্‌দা করতে বলতাম।" [২৪০]

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্য হলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার প্রতি তার আনুগত্যেরই অংশ। অতএব স্বামীর অধিকারসমূহ পূর্ণ করার অর্থ হলো আল্লাহর অধিকারসমূহ পূর্ণ করা।

বস্তুত, ইসলামে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর ওপর একটি বাধ্যতামূলক কর্তব্য। স্বামীর আনুগত্য করা একটি ইবাদত, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কেবল তাঁর উদ্দেশ্যেই

[২৪০] হাদীসটি আত-তিরমিযি, আহ্‌মাদ, আল-হাকিম এবং ইবনু মাজাহ্ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ্ বলে মত দিয়েছেন (ইরওয়া আল-গালীল, হাদীস নং ১৯৯৮ এবং সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫২৩৯, ৫২৯৪)।

নিবেদিত। আমরা অনেকগুলো বর্ণনায় দেখেছি যেগুলোতে স্বামীর আনুগত্য করার জন্য এবং পরিবার পরিচালনায় স্বামীকে আন্তরিক সহযোগিতা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশগুলো দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে এমন আরও অনেক বর্ণনা রয়েছে যেগুলোতে স্ত্রীর প্রতি এই নির্দেশগুলো আরও সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে। আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "কোনো নারী যখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রামাদ্বান মাসে সিয়াম পালন করে, তার সতীত্ব রক্ষা করে এবং তার স্বামীর আনুগত্য করে, তাকে (কিয়ামাতের দিন) বলা হবে, 'জান্নাতের (আটটি) দরজার যেকোনোটি দিয়ে এতে প্রবেশ করো।'"[২৪১]

পক্ষান্তরে, স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করা কাবীরা গুনাহ, যার ফলে অন্যান্য ইবাদত-সমূহ আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে। ইবনু 'উমার ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "দুই ব্যক্তির দু'আ তাদের মাথার ওপরে আর যায় না—সেই দাসের, যে তার মালিকের থেকে পালিয়ে যায় এবং যতক্ষণ ফিরে না আসে; এবং সেই নারীর, যে তার স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত (আনুগত্যে) ফিরে না আসে।"[২৪২]

আনুগত্যের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা রয়েছে, যেগুলো অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। নিম্নোল্লিখিত দিকনির্দেশনাগুলোর অধিকাংশই পূর্বের অধ্যায়গুলোতে উল্লেখ করা হলেও এখানে সেগুলো সহজ সূত্রে পুনরায় উল্লেখ করা হলো।

- স্বামীর আনুগত্যের মাধ্যমে স্ত্রী মূলত আল্লাহর আনুগত্যই করে থাকে; কারণ, স্বামীর আনুগত্য করাকে আল্লাহ ﷻ নারীর জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন।
- স্ত্রী তার স্বামীর আনুগত্য করবে কেবল ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত তা স্ত্রীর সাধ্যের মধ্যে থাকে।
- কেবল সেইসব ক্ষেত্রেই স্বামীর আনুগত্য করা যাবে যেগুলোতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় না।

---

[২৪১] হাদীসটি ইবনু হিব্বান সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৬৬০ এবং আদাবুয-যিফাফ, পৃষ্ঠা নং ২৮৬)।

[২৪২] হাদীসটি আল-হাকিম এবং আত-তাবারানি সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ১৩৬ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ২৮৮)।

স্বামীর কর্তৃত্বকে যে স্ত্রী আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছে, স্ত্রীকে তার প্রমাণ দিতে হবে স্বামীর আদেশ-নিষেধ পালন, তার সেবাযত্ন এবং তাকে সহযোগিতার মাধ্যমে। মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যদি একজন নারী তার স্বামীর অধিকার সম্পর্কে জানত, তা হলে সে ততক্ষণ পর্যন্ত বসত না যতক্ষণ না সে (স্বামী) তার রাতের খাবার সম্পন্ন করে।"[২৪৩]

স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও মমত্ববোধ

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যসমূহ পালন করার অংশ হলো স্বামীর সাথে উত্তম ও সম্মানজনক আচরণ করা এবং স্বামীর ক্ষতি হয় এমন কাজ পরিহার করা।

উপরে যেমনটি আলোচনা করা হয়েছে তাতে, স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অনুগ্রহ অনেক। এই অনুগ্রহ কেবল অর্থনৈতিক অধিকারের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক অধিকার অনুগ্রহসমূহের একটি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলো শুধু অর্থনৈতিক অধিকারের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এ ছাড়াও রয়েছে স্ত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, ভালো-মন্দ দেখা, সুখ-দুঃখে সমঅংশীদার হওয়া, মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালোবাসা ইত্যাদি। স্ত্রীর উচিত স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং অনুগ্রহের প্রতিদানস্বরূপ স্বামীর সাথে মমতামাখা উত্তম আচরণ করা।

এ ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন খাদিজা ﷺ যিনি নবিজি ﷺ-এর চেয়ে অনেক বেশি সম্পদশালী ছিলেন। অথচ তাঁর অর্থনৈতিক অগ্রগণ্যতা তাঁকে অহংকারী কিংবা স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞ করে তোলেনি; বরং তিনি ছিলেন বিনম্রতা ও মমত্ববোধের সুমহান দৃষ্টান্ত যা নবিজি ﷺ তাঁর সারাটা জীবন স্মরণে রেখেছিলেন।

কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীর অনুগ্রহ স্বীকার করতে অনাগ্রহী হয়, তা হলে স্বামী অসন্তুষ্ট হওয়ার আগেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেই স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আল্লাহ সেই নারীর দিকে (করুণার দৃষ্টিতে) তাকান না যে তার স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। অথচ সে তাকে (স্বামীকে) ছাড়া জীবন যাপন করতে পারে না।"[২৪৪]

---

[২৪৩] হাদীসটি আত-তাবারানি এবং আল-বায্যার সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫২৫৯)।

[২৪৪] হাদীসটি আন-নাসা'ঈ (আল-কুবরা গ্রন্থে) এবং অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ২৮৯)।

আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার, আবু হুরায়রা এবং আবু সা'ঈদ আল-খুদরি ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ নারীদের উদ্দেশে বলেছেন:

> "হে নারীরা, তোমরা সাদাকাহ্ করো এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও, কারণ, জাহান্নামের অধিকাংশদের মাঝেই আমি তোমাদেরকে (নারীদেরকে) দেখেছি। (এর কারণ, হলো) তোমরা অধিক অভিশাপ দাও আর তোমরা তোমাদের স্বামীদের প্রতি অকৃতজ্ঞ।"[২৪৫]

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আচরণ হতে পারে স্ত্রীর জান্নাতে অথবা জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয়।

হুসাইন ইবনু মিহসান ﷺ বর্ণনা করেন, তার এক খালা নবিজি ﷺ এর সাথে দেখা করতে গেলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি স্বামী আছে?" মহিলা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তার সাথে কেমন আচরণ করো?" তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার সাধ্যমতো আমি চেষ্টা করি তার কোনো নির্দেশ অমান্য না করতে।' তিনি ﷺ বললেন:

> "লক্ষ রেখো, তার কাছে তোমার অবস্থান কোথায়। কারণ, সে হয় তোমার জান্নাত, না হয় জাহান্নাম (যাওয়ার পথ)।"[২৪৬]

নারীদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট হলো সেই নারী যে স্বামীর প্রতি মমতাময়ী এবং উত্তম আচরণকারিণী। আবূ উসাইনাহ্ আস-সাদাফি বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "তোমাদের নারীদের মধ্যে তারাই সর্বোৎকৃষ্ট যারা অধিক সন্তান জন্মদাত্রী, (তাদের স্বামীদের প্রতি) প্রেমময়ী, প্রশান্তিদানকারিণী এবং সহিষ্ণু, যদি তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি থাকে। আর তোমাদের নারীদের মধ্যে তারাই সর্বনিকৃষ্ট যারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে এবং দর্পভরে হাঁটাচলা করে। ওরা মূলত কপটাচরিণী। লাল পা এবং লাল ঠোঁটওয়ালা কাক যেমন অতি বিরল, তেমনি এদের জান্নাতে প্রবেশও হবে অতি বিরল।"[২৪৭]

---

[২৪৫] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[২৪৬] হাদীসটি আহমাদ এবং আল-হাকিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে হাসান বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ১৫০৯)।

[২৪৭] হাদীসটি আল-বায়হাকি (আস-সুনান গ্রন্থে) এবং অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৩৩৩০ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৮৪৯)। (কাক-সম্পর্কিত) হাদীসের শেষাংশটুকু 'আমর ইবনুল 'আস ﷺ থেকে আহমাদ এবং অন্যান্যরা সংকলন করেছেন যা আল-আলবানি সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৮৫০)।

স্বামীকে কষ্ট না দেওয়া

কোনো নারী যখন তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, জান্নাতের রমণীগণ তখন সেই নারীকে অভিশাপ দিতে থাকে; যা ওই নারীর প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ। মু‘আয ইবনু জাবাল ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "দুনিয়ার জীবনে কোনো স্ত্রী তার স্বামীকে কষ্ট দিলে, ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হূরদের মধ্য থেকে তার (ভবিষ্যৎ) স্ত্রীগণ বলে—তুমি তাকে কষ্ট দিয়ো না, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন! সে অল্প দিনের জন্য তোমার সাথে রয়েছে এবং শিগ্গিরই আমাদের কাছে চলে আসবে।" [২৪৮]

স্বামীর সেবা-যত্ন করা

নিজের সাধ্যমতো স্বামীর সেবা-যত্ন করা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য ও আনুগত্যের অংশ। স্বামীর সেবা-যত্ন করা, নিত্যদিনের সাংসারিক কাজকর্ম করা, খাবার পরিবেশন করাসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাজগুলো এই দায়িত্ব-আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এখানে আবারও মু‘আয ইবনু জাবাল ﵁ থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করছি, যাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যদি কোনো নারী তার স্বামীর অধিকার সম্পর্কে জানত, তা হলে সে ততক্ষণ বসত না, যতক্ষণ না তার স্বামী তার রাতের খাবার খাওয়া সম্পন্ন করত।" [২৪৯]

কোনো নারীই এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়, যদি না স্বামী তার এই দায়িত্বকে হালকা করে দেয়। ইবনুল কায়্যিম উল্লেখ করেছেন—'স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সেবা-যত্নের বিষয়টি এমন, যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে ধনী-গরিব এবং সম্ভ্রান্ত-নিম্নবিত্ত বলে নারীদের মাঝে পার্থক্য করা সঠিক নয়। নারীদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট নারী (ফাতিমা) তাঁর স্বামীর সেবা-যত্ন করতেন। তা করতে গিয়ে তিনি যে কষ্টের মুখোমুখি হতেন, তার অভিযোগ নিয়ে তিনি পিতা ﷺ-এর কাছে আসেন, কিন্তু তিনি তার দাবি পূরণ করেননি।' [২৫০]

---

[২৪৮] হাদীসটি আহমাদ এবং আত-তিরমিযিসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৭১৯২ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৭৩)।

[২৪৯] হাদীসটি আত-তাবারানি এবং আল-বাযযার সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৫২৫৯)।

[২৫০] যাদুল মা‘আদ, ৫:১৬০।

স্বামীকে পরিতৃপ্ত রাখা

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর মমত্ববোধ ছাড়াও স্বামীকে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত করার জন্য ইসলামী শারী'আহ্র সীমারেখার মধ্যে থেকে স্ত্রীকে সাধ্যমতো সবকিছুই করতে হবে। একজন আদর্শ এবং উত্তম স্ত্রী তার চেহারা-সৌন্দর্যের মাধ্যমে স্বামীকে খুশি করার চেষ্টা করে। আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে-ই—যে তাকে (স্বামীকে) খুশি করে যখন সে (স্বামী) তার দিকে তাকায়, তার আনুগত্য করে যখন সে (স্বামী) আদেশ করে, এবং নিজের ও নিজের সম্পদ সম্পর্কে এমন কিছু করে না যার কারণে সে (স্বামী) অসন্তুষ্ট হয়।" [২৫১]

একই মর্মে, আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'নারীদের মধ্যে সর্বোৎত্তম কারা?' তিনি উত্তরে বলেছিলেন:

> "নারীদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে-ই—যাকে দেখলে তার স্বামীর মন পরিতৃপ্ত হয়, (স্বামী) আদেশ করলে সে তা পালন করে, এবং তার অনুপস্থিতিতে সে নিজেকে এবং স্বামীর সম্পদকে পাহারা দেয়।" [২৫২]

এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো—স্বামীকে 'পরিতৃপ্ত' করতে হবে শুধু সেই উপায়ে যা ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ তাকে পরিতৃপ্ত করার জন্য এমন কোনো আচরণ করা যাবে না, যাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন। হিজাব, বিনম্র শালীন আচরণ এবং উত্তম গুণাবলির সমন্বয়ে স্ত্রী হবে একজন অনুকরণীয় ইসলাম পালনকারী নারী, যার পরশে প্রকৃত ঈমানদার স্বামীর অন্তরাত্মা ভরে উঠবে অনাবিল সুখে এবং প্রশান্তিতে। 'পরিতৃপ্তি'র চূড়ান্ত রূপ বলতে এটিকেই বোঝানো হয়েছে।

স্বামীর শারীরিক চাহিদা পূরণ করা

জৈবিকজীবনের পবিত্রতা রক্ষা করা বিয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কোনো নিষিদ্ধ পথে ধাবিত না হয়ে নিজের কামনাকে শুধু স্ত্রীর জন্য সুরক্ষিত রেখে একজন পুরুষ

---

[২৫১] হাদীসটি আহ্মাদ, আন-নাসা'ঈ এবং আল-হাকিম সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৩২৯৮ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৮৩৮)।

[২৫২] হাদীসটি আত-তাবারানি (আল-কাবির গ্রন্থে) এবং অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৩২৯৯ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১৮৩৮)।

তার যৌনজীবনের পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখে। অতএব স্বামীর মনোবাসনা পূরণের জন্য সর্বদা আগ্রহী ও প্রস্তুত থাকা স্ত্রীর আবশ্যিক দায়িত্ব। অধিকন্তু, স্বামী কর্তৃক বিছানায় আসার আহ্বানে সাড়া না দিলে স্ত্রীর কবিরা গুনাহ্ হবে। 'আব্দুল্লাহ্ ইবনু আই আফওয়া বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "সেই সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ততক্ষণ পর্যন্ত একজন স্ত্রী সত্যিকার অর্থে তার প্রতিপালকের (আল্লাহর) হক আদায় করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার স্বামীর সমস্ত হকগুলো আদায় করে। এমনকি সে যদি তাকে (স্ত্রীকে) উটের পিঠে থাকা অবস্থায় পেতে চায়, তাহলেও সে (স্ত্রী) তার চাওয়া প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না।"[২৫৩]

উল্লিখিত হাদীস থেকে আমরা দেখি যে—স্ত্রী তার স্বামীর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ইতস্তত কিংবা অসম্মতি জানাতে পারবে না; এমনকি এমনটি করতে গিয়ে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি হলেও, যদি না স্ত্রী নেহায়েত কোনো অসুস্থ বা শারীরিক অসমর্থ হয়। এই মর্মে যায়েদ ইবনু আরকাম ؓ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় আসার জন্য আহ্বান করে, স্ত্রীকে তার আহ্বানে সাড়া দিতে হবে, এমনকি সে (স্ত্রী) উটের পিঠে বসা থাকলেও।"[২৫৪]

তালাক ইবনু 'আলؓ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যখন কোনো পুরুষ তার চাহিদা পূরণের জন্য স্ত্রীকে আহ্বান করে, তখন সে (স্ত্রী) বাইরের চুলোয় (রান্নাবান্নার) কাজে ব্যস্ত থাকলেও তার আহ্বানে সাড়া দিতে হবে।"[২৫৫]

স্বামীর দৈহিক চাহিদা পূর্ণ করা যেহেতু স্ত্রীর প্রধান দায়িত্বগুলোর একটি, তাই স্ত্রীর এ ক্ষেত্রে অস্বীকৃতি জানানো কবিরা গুনাহ। এটা মালা' ইকাদের (ফেরেশতাদের) অভিশাপ, এবং আল্লাহর কাছে ক্রোধযোগ্য একটি অপরাধ। আবু হুরায়রা ؓ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

---

[২৫৩] হাদীসটি আহ্মাদ এবং ইবনু মাজাহ্সহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আদাবুয্ যিফাফ, হাদীস নং ৮৪)।

[২৫৪] হাদীসটি আল-বায্যার এবং অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১২০৩ এবং সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫৩৩)।

[২৫৫] হাদীসটি আহ্মাদ এবং আন-নাসা'ঈসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (আস-সহীহাহ, হাদীস নং ১২০২ এবং সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫৩৪)।

> "যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় আহ্বান করে, আর সে যেতে রাজি না হয় এবং সে (স্বামী) রাগান্বিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তা হলে সকাল পর্যন্ত মালা'ইকাগণ তাকে (স্ত্রীকে) অভিশাপ দিতে থাকেন।" [২৫৬]

স্বামীর কামনা ও মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য যেহেতু স্ত্রীকে সর্বদাই প্রস্তুত এবং আগ্রহী থাকতে হবে, তাই স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর কোনো নফল সিয়াম পালনের বিধান নেই। এই নিষেধাজ্ঞার কারণ, হলো, 'নফল' সিয়াম পালন করতে গিয়ে স্বামীর মনোবাসনা পূর্ণ করার মতো 'ফরয' বিষয় বিঘ্নিত হতে পারে। আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "স্বামী উপস্থিত থাকলে, তার অনুমতি ছাড়া সিয়াম পালন করা কোনো নারীর জন্য অনুমোদিত নয়—রামাদ্বান ছাড়া। আর স্বামী যদি অনুপস্থিত থাকে, তা হলে সে তার (স্বামীর) অনুমতি ছাড়া তার বাড়িতে কাউকে প্রবেশ করতে দেবে না, এবং তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী যা কিছু খরচ করবে নিশ্চয়ই স্বামী তার থেকে অর্ধেক সাওয়াব পাবে।" [২৫৭]

নফল সিয়াম পালনের নিষেধাজ্ঞার মতোই নিজেকে অন্যান্য মাত্রাতিরিক্ত ইবাদতকর্মে নিয়োজিত রাখাও স্ত্রীর উচিত নয়। এতে স্বামীর প্রতি তার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

সন্তান প্রতিপালন ও শিক্ষা প্রদান

সন্তানদেরকে লালন-পালন করা স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই যৌথ দায়িত্ব। তবে এ ক্ষেত্রে নারীর দায়িত্বের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ,, স্বাভাবিকভাবেই বাবা জীবিকা অর্জন, ধর্মীয় ও সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য ঘরের বাইরেই অধিক সময় ব্যয় করেন। পক্ষান্তরে মা-ই সন্তানদের সাথে বেশি সময় কাটান। ফলে সন্তানদের আদর-যত্ন, তত্ত্বাবধান, লেখাপড়ার খেয়াল রাখা এবং তাদেরকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেওয়ার মতো যাবতীয় দায়িত্ব মায়ের জন্যই বেশি প্রাসঙ্গিক।

বিয়ের সর্বোত্তম ফসল হলো সন্তান-সন্ততি। দাম্পত্য-জীবনের সাফল্য বা ব্যর্থতার স্থায়ী ফল বা বহিঃপ্রকাশ হলো তারা। সন্তানদেরকে সব রকম ক্ষয়ক্ষতি থেকে আগলে রাখা এবং ইসলামের সুশিক্ষায় বড় করে তোলাই হলো শয়তান এবং জাহান্নামের

---

[২৫৬] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[২৫৭] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

আগুন থেকে মা-বাবা-সন্তান নির্বিশেষে সবার রক্ষা পাওয়ার নিশ্চিত উপায়। আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

« হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর মালাই'কাগণ, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তাঁর অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।[২৫৮] »

সন্তানদেরকে লালন-পালন করা নারীর প্রধানতম দায়িত্বগুলোর অন্যতম। এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারলে নারীর হৃদয়ে যেমন আসে এক অনাবিল সুখ এবং পরিতৃপ্তি, ঠিক তেমনি স্বামীর হৃদয়েও তৈরি হয় একই অনুভূতি। নারীর উচিত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সন্তান মানুষ করার এই দায়িত্ব পালন করা। সামান্য কয়টা টাকা উপার্জনের দোহাই দিয়ে বাড়ির বাইরে সময় কাটিয়ে কিংবা টেলিভিশনে নিরর্থক সব অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে এই দায়িত্বকে অবহেলা করা তার উচিত নয়।

সন্তানদেরকে স্তন্যদান করা

সন্তানদেরকে তাদের দুবছর বয়স পর্যন্ত নিজের বুকের দুধ পান করানো নারীর আবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾

« আর মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দুবছর দুধ পান করাবে, (এটা) তার জন্য যে দুধ পানের সময় পূর্ণ করতে চায়।[২৫৯] »

সত্যিকার অর্থেই স্বাস্থ্যগত সমস্যার মতো কোনো ঝুঁকি বা ইসলামী কারণ, না থাকলে, নারী তার এই কর্তব্য এড়াতে পারবে না। যেসব নারী তাদের নবজাতক সন্তানদের এই অধিকারকে অবহেলা কিংবা অস্বীকার করবে, তারা কবরে এবং বিচারের দিনে কঠিন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। শরীর কিংবা বক্ষকে 'ফিট' রাখার অজুহাত দেখিয়ে এ কাজ থেকে বিরত থাকা মহিলারা সেদিন আর আল্লাহর আযাব আমার থেকে নিজেদের শরীরকে রক্ষা করতে পারবে না।

---

[২৫৮] আত-তাহ্‌রিম, ৬৬:৬।

[২৫৯] আল-বাকারাহ, ২:২৩৩।

আবু উমামাহ্ আল-বাহিলি ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম, দুজন লোক (মালা'ইকাহ্) আমার কাছে এল, আমার দুই বাহু ধরে আমাকে এক পাথরের কাছে পাহাড়ে নিয়ে গেল। তারা বলল, 'আরোহণ করুন।' আমি বললাম, 'আমি এতে আরোহণ করতে পারি না।' তারা বলল, 'আমরা আপনার জন্য এটা সহজ করে দেবো'।"
>
> তিনি ﷺ বলতে থাকলেন,... "(এখানে তিনি একের পর এক অনেকগুলো স্তরে আরোহণের কথা বর্ণনা করেন) আমরা উঠতেই থাকলাম যতক্ষণ না আমি নারীদেরকে দেখলাম যাদের স্তনগুলোতে সাপ দংশন করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এদের কী হয়েছে?' তারা উত্তর দিলো, 'এরা হলো সেই নারীরা যারা তাদের সন্তানদেরকে দুধ পান করাতে অস্বীকার করেছিল...'।"[২৬০]

স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা

স্ত্রীর ওপর অর্পিত স্বামীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোর একটি হলো স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে তার স্বামীর অর্থ-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন:

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾

« সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, আল্লাহ্ যা সুরক্ষিত রাখতে বলেছেন তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে তা সুরক্ষিত রাখে।[২৬১] »

স্বামীর অনুমতি বা মৌন সম্মতি (যদি স্ত্রী নিশ্চিত থাকে, স্বামী তাতে কিছু মনে করবে না) ছাড়া স্ত্রী তার স্বামীর কোনো অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে পারবে না; এমনকি দান বা সাদাকার উদ্দেশ্যেও না। আব্দুল্লাহ্ ইবনু 'আমর ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "স্বামী যদি অনুমতি না দেয়, তা হলে স্ত্রীর জন্য দান করারও অনুমতি নেই।"[২৬২]

---

[২৬০] হাদীসটি ইবনু খুযাইমাহ্ (হাদীস নং ১৯৮৬) এবং ইবনু হিব্বানসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুত তারগীব, হাদীস নং ৯৯১)।

[২৬১] আন-নিসা, ৪:৩৪।

[২৬২] হাদীসটি আবু দাউদ সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৭৬২৬ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৮২৫)।

রান্নাবান্না করে খাবারের প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যের অন্যতম একটি এবং তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কাউকে খাবার দিতেও পারবে না। আবু উমামাহ আল-বাহিলি ﷺ এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেন, বিদায় হাজ্জের ভাষণে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য যথাযথ অধিকার নির্ধারণ করেছেন; কাজেই কোনো উত্তরাধিকারীকে (নির্ধারিত) পরিমাণের বাইরে দেওয়া যাবে না। এবং কোনো নারী তার সংসার থেকে স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোনো কিছু ব্যয় করতে পারবে না।" [২৬৩]
>
> কেউ একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, এমনকি খাদ্যও নয়?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'সেটা তো আমাদের সর্বসেরা সম্পদ'।

স্বামী আপত্তি করবে না জেনে স্ত্রী যদি স্বামীর অর্থ থেকে সাদাকা করে, তা হলে স্ত্রী পাবে অর্ধেক পুরস্কার এবং স্বামী তার বাকি অর্ধেক। আবু হুরায়রা ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "স্বামীর নির্দেশ ছাড়াই কোনো নারী তার (স্বামীর) উপার্জন থেকে সাদাকা করলে সে (স্বামী) অর্ধেক সাওয়াব পায়।" [২৬৪]

আইশাহ ﷺ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "(সংসারের) কোনো ক্ষতি না করে, কোনো নারী (সাদাকা হিসেবে) তার বাড়ি থেকে খাদ্য দান করলে, তার এই ব্যয় করার জন্য সে সাওয়াব পায়, এবং তার স্বামীও সাওয়াব পায়, কারণ, সে তার (খাদ্যের) ব্যবস্থা করেছিল।" [২৬৫]

পরপুরুষ থেকে সতর্ক থাকা

দাম্পত্য-জীবন পরস্পর বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পুরো পরিবারের জন্য স্ত্রীর আচরণ হতে পারে সকলের সম্মান এবং মর্যাদার উৎস কিংবা কলঙ্কের কারণ,। স্বামীর বিশ্বাস এবং মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ এবং সমুন্নত রাখতে স্ত্রীকে এমন সকল পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে হবে যাতে স্বামীর মনে কিংবা অন্য মানুষের মনে সন্দেহের জন্ম না দেয়। পোশাক-পরিচ্ছদে নারীকে হতে হবে শালীন এবং পর্দানশীন। অন্যদের সামনে তার

---

[২৬৩] হাদীসটি আবু দাউদ এবং ইবনু মাজাহসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহ আবি দাউদ, হাদীস নং ৩০৪৪)।

[২৬৪] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[২৬৫] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

বেশ-ভূষায় এমন সকল কিছু বর্জন করতে হবে যা পুরুষদের নজর কাড়ে অথবা তাদের মনে কুচিন্তার উদ্রেক হয়।

ফুদালাহ্ ইবনু উদায়েদ ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "তিন (ধরনের) ব্যক্তি আছে যাদের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞেস করার দরকার নেই (কারণ, তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত) : যে ব্যক্তি ঐক্য নষ্ট করে, তার ইমামের (শাসকের) বিরুদ্ধাচরণ করে, এবং কুফ্‌রি অবস্থায় মারা যায়; যে দাস বা দাসী তার মালিক থেকে পালিয়ে যায় এবং ওই (পলাতক) অবস্থায় মারা যায়; এবং সেই নারী, যে তার স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজেকে সুসজ্জিত করে (অন্য পুরুষের জন্য)—এমনকি যদিও সমস্ত পার্থিব দুশ্চিন্তা থেকে নিরাপদ রাখার জন্য সে (তার স্বামী) যথেষ্ট হয়েছিল। অতএব তাদের ব্যাপারে তোমাদের জানতে চাওয়ার প্রয়োজন নেই।"[২৬৬]

খোলামেলাভাবেই হোক আর ইশারা-ইঙ্গিতেই হোক, স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতেই পারবে না। স্বামী অনুমতি দিলেও পরপুরুষের সাথে নারীর কথা হবে সীমিত, আনুষ্ঠানিক এবং যতটুকু না বললেই নয় কেবল ততটুকু।

'আমর ইবনুল 'আস﵁ বর্ণনা করেন:

> "তাদের স্বামীদের অনুমতি ছাড়া নারীদের সাথে কথা বলা নবিজি ﷺ নিষিদ্ধ করেছেন।"[২৬৭]

নারী এমন কোনো পুরুষের সাথে একাকী হতে পারবে না—যে পুরুষ তার স্বামীও নয়, আবার মাহ্‌রামও নয়। ইবনু 'উমার ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "আজকের পর থেকে কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ না করে; তবে তার (সাক্ষাৎকারী পুরুষের) সাথে দুএকজন অন্য পুরুষ থাকলে ভিন্ন কথা।"[২৬৮]

ইবনু আব্বাস ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ বলেছেন:

---

[২৬৬] হাদীসটি আল-বুখারি (আদাবুল মুফ্‌রাদ) এবং আল হাকিম সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৩০৫৮ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৫৪২)।

[২৬৭] হাদীসটি আত-তাবারানি (আল-কাবির) সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৬৮১৩ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ৬৫২)।

[২৬৮] হাদীসটি মুসলিম এবং আহ্‌মাদ সংকলন করেছেন।

> "কোনো নারী তার সাথে কোনো মাহ্‌রাম ছাড়া ভ্রমণ করতে পারবে না। এবং কোনো (অনাত্মীয়) পুরুষ তার সান্নিধ্যে আসতে পারবে না, যদি না তার (নারীর) সাথে কোনো মাহ্‌রাম থাকে।"[২৬৯]

স্বামীর অনুমতি ছাড়া কাউকে প্রবেশাধিকার না দেওয়া

স্বামীর সম্মতি না নিয়ে কাউকে স্বামীর বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া স্ত্রীর উচিত নয়। আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "স্বামী কাছে থাকলে তার অনুমতি না নিয়ে সিয়াম পালন করা কোনো নারীর জন্য অনুমোদিত নয়; কেবল রামাদ্বান ছাড়া। স্বামীর অনুমতি না নিয়ে তার বাড়িতে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়াও স্ত্রীর জন্য অনুমোদিত নয়।"[২৭০]

স্বামীর সম্মতি ইশারা-ইঙ্গিতেও হতে পারে। যেমন: স্ত্রীর যদি জানা থাকে, পাশের বাড়ির কোনো মহিলা তার সাথে দেখা করতে আসলে স্বামী তাতে আপত্তি করবে না, তা হলে ওই মহিলা যতবার তার সাথে দেখা করতে আসবে, প্রত্যেকবার আলাদাভাবে স্বামীর কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

মাহ্‌রাম ছাড়া ভ্রমণ না করা

কোনো নারী মাহ্‌রাম ছাড়া ভ্রমণে যেতে পারবে না। ভ্রমণকালে ভ্রমণকারী ব্যক্তি স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। এসময় আক্রান্ত হওয়ার এবং প্রলোভনের শিকার হওয়ার আশঙ্কাও থাকে বেশি। এমনকি আজকের দিনের আধুনিক ভ্রমণব্যবস্থাতে এমনটি অহরহ ঘটতে দেখা যায়। অতএব নিজের সুরক্ষা এবং সহায়তার জন্য একজন নারীকে অবশ্যই তার সাথে একজন পুরুষকে রাখতে হবে।

আবু হুরায়রা ﵁ বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "কোনো মাহ্‌রামের সঙ্গ ছাড়া নারীর জন্য ভ্রমণ করার অনুমতি নেই।"[২৭১]

এ ছাড়া আবু হুরায়রা ﵁ আরও বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

---

[২৬৯] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন।

[২৭০] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিম সংকলন করেছেন।

[২৭১] হাদীসটি মুসলিম সংকলন করেছেন।

"মাহ্‌রামের সঙ্গ ব্যতীত কোনো নারীর জন্য এক বারিদ দূরত্ব[২৭২] ভ্রমণ করা বৈধ নয়।" [২৭৩]

অকারণে বাড়ির বাইরে না যাওয়া

সাধারণত, বাড়িই হলো একজন নারীর জন্য তার স্বাভাবিক আবাসস্থল। নারীর গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যসমূহ এবং সেগুলোর সফল সম্পাদনের ক্ষেত্র হলো বাড়ি। বাড়িই হলো নারীর জন্য নিরাপদ এবং সুরক্ষিত আবাস, যা তাকে সব রকম সন্দেহজনক পরিস্থিতি ও বিপদ থেকে আগলে রাখে। একজন মুসলিম নারী প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যাবে না। পরপুরুষদের সাথে মিশতে হয় বা তাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার আশঙ্কা থাকে, এমন জায়গা থেকে সে নিজেকে লজ্জায় সরিয়ে রাখবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উম্মাহাতুল মু'মিনীনদেরসহ সকল মুসলিম নারীদেরকে এই বলে উপদেশ দিয়েছেন:

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴾

« আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক-জাহেলী যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন কোরো না।[২৭৪] »

নিজ বাড়ির বাইরে কোথাও পোশাক খোলা নারীর জন্য নিষেধ। কিছু নারীদের এমন রীতি ছিল, নারীদের জন্য নির্মিত গণস্নানাগারে তারা পোশাক বদলাতো এবং গোসল করত। নবিজি ﷺ এমনটি করাকে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং বলেছেন, যে নারী এমনটি করে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়ার যোগ্য হবে না।

আবুল মালিহ আল-হুসালি ؓ বর্ণনা করেন, হিম্স[২৭৫] গোত্রের কিছু মহিলা 'আইশাহর সাথে সাক্ষাৎ করল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কি ঐসব লোকদের স্ত্রী যারা তাদের নারীদেরকে গণস্নানাগারে যাওয়ার অনুমতি দেয়?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।' অতঃপর তিনি বললেন, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন:

---

[২৭২] ইবনু খুযাইমাহ একে ১২ হাশিমি মাইল বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ইংরেজি পরিমাপ অনুযায়ী, এক বারিদ সমান ১৮ মাইল।

[২৭৩] হাদীসটি আবু দাউদ এবং আল-হাকিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ৭৩০২ এবং আস-সহীহাহ, হাদীস নং ২৪২১)।

[২৭৪] আল-আহযাব, ৩৩:৩৩।

[২৭৫] দামাস্কের উত্তরাঞ্চলের একটি শামি শহর।

> "যে নারী স্বামীগৃহ ছাড়া অন্য কোথাও তার পোশাক খুলল, বস্তুত সে তার নিজের এবং আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা)-এর মাঝের আবরণকে ভেঙে ফেলল।" [২৭৬]

একই মর্মে, উম্মু সালামাহ ﵂ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে নারী স্বামীগৃহ ছাড়া অন্য কোথাও তার পোশাক খুলল, তা হলে আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) ওই নারীর জন্য তাঁর নিরাপত্তাকে অপসারণ করে দেবেন।" [২৭৭]

উল্লিখিত হাদীসটি ওই নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত গ্রীনরুম, ড্রেসিংরুম, সাজঘর কিংবা এমন যেকোনো স্থানে নিজের গায়ের পোশাক খোলে; যেখানে কোনো পরপুরুষ বা নারী তার শরীরের সেসব অংশবিশেষ দেখে ফেলার আশঙ্কা রয়েছে—যেগুলো কেবল নিজের স্বামীই দেখতে পারে।

ভান করা এবং মিথ্যা দাবি পরিহার করা

নারীরা প্রায়ই নিজের যা আছে তা দেখাতে এবং যা নেই তা আছে বলে ভান করতে পছন্দ করে। এটি এক ধরনের মিথ্যাচার যা ইসলামে নিষিদ্ধ। একজন পুণ্যবতী নারী স্বচ্ছ আয়নার মতো, যা উত্তম প্রতিচ্ছবি উপহার দেয়। আসমা' ﵂ বর্ণনা করেন, এক মহিলা জিজ্ঞেস করল, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার একজন সতীন আছে। (তাকে খ্যাপানোর জন্য) আমি যদি আমার স্বামী আমাকে যা দেয়নি অথচ তা আমার কাছে আছে বলে ভান করি, তা হলে কি অন্যায় হবে?' তিনি ﷺ উত্তর দিলেন:

> "কোনো ব্যক্তি যে নিজের এমন কিছু আছে বলে ভান করে যা তার নেই, সে ওই ব্যক্তির মতো যে প্রতারণার দুটো পোশাক পরিধান করে।" [২৭৮]

মেয়ের প্রতি এক মায়ের উপদেশ

ইসলাম-পূর্ব আরবে, একজন মা তার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে মেয়ের উদ্দেশে নিচের উপদেশটি দিয়েছিলেন। উপদেশটিতে এক পরিপক্ক এবং গভীর অভিজ্ঞতাবোধ ফুটে উঠেছে। স্বামীর সন্তুষ্টির জন্য স্ত্রীর করণীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোও খুব অল্প কথায়

---

[২৭৬] হাদীসটি আহমাদ, আত-তিরমিযি এবং ইবনু মাজাহসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৭১০)।

[২৭৭] হাদীসটি আহমাদ, এবং আল-হাকিমসহ অন্যান্যরা সংকলন করেছেন। আল-আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে মত দিয়েছেন (সহীহুল জামে', হাদীস নং ২৭০৮)।

[২৭৮] হাদীসটি আল-বুখারি এবং মুসলিম সংকলন করেছেন।

চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

কিন্দাহ্[২৭৯]-এর রাজা, 'আমর ইবনু হিজ্‌র-এর সাথে উম্মু আয়াস বিন্‌ত 'আউফের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ে অনুষ্ঠানের অল্প কিছুক্ষণ আগে তার মা উমামাহ বিন্‌ত আল-হারিস তাকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলেন:

> "মা! যারা পুণ্যবতী ও উত্তম আচরণের অধিকারিণী, এই উপদেশ যদি তাদেরকে না দিলেও চলত, তা হলে তোমার জন্যও এই উপদেশের প্রয়োজন হতো না। তবে উপদেশ ভুলোমনাদের জন্য স্মরণিকা আর জ্ঞানীদের জন্য দিকনির্দেশনা। বাবা-মা'র বিত্ত-বৈভব কিংবা মেয়ের প্রতি তাদের আদর-স্নেহ থাকার কারণেই যদি কোনো নারী বিয়ে এড়াতে পারত, তা হলে তোমার বিয়ের একেবারেই কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পুরুষের জন্যই নারীর সৃষ্টি, আর নারীর জন্যই পুরুষ।
>
> তুমি তোমার বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছ—যেখানে তুমি জন্মেছিলে, যে বাসস্থানে তুমি প্রতিপালিত হয়েছ। যাচ্ছ এমন পরিবেশে—যার সঙ্গে তুমি মোটেও পরিচিত নও। মিলিত হবে এমন সঙ্গীদের সঙ্গে—যাদের তুমি চেনো না। স্বামীগৃহে এখন থেকে স্বামী হবে তোমার কর্তা ও প্রহরী। অতএব তুমি তার দাসী হয়ে যাও, সে তোমার দাস হয়ে যাবে। আনুগত্যে তুমি তার জন্য মাটি হয়ে যাও। সে আকাশ হয়ে তোমাকে আগলে রাখবে। তার জন্য তুমি নিজের ভেতরে দশটি বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করো। এগুলোই তোমার জন্য অমূল্য সঞ্চিত ধন হয়ে যাবে:

- সন্তুষ্ট চিত্তে এবং পরিতৃপ্ত অন্তরে তুমি নিজেকে তার হাতে তুলে দেবে। তোমাকে সে যা দেবে, তুমি তাতেই তুষ্ট থেকো।
- তুমি হবে তার কথার মনোযোগী শ্রোতা এবং তার আদেশের আনুগত্যকারিণী।
- তার নজর পড়ে এমন জায়গাগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। তার দৃষ্টি যেন তোমার এমন কিছুর ওপর না পড়ে, যা তার চোখে দৃষ্টিকটু।
- তার নাকে লাগার স্থানগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। সে যেন সুবাস ছাড়া তোমার কাছে কোনো গন্ধ না পায়।
- তার খাবার সময়ের ব্যাপারে যত্নশীল থাকবে। কারণ, ক্ষুধার তীব্রতায় ক্রোধের জন্ম হয়।
- তার ঘুমের সময়ের ব্যাপারে যত্নশীল থাকবে। কারণ, ঘুমের ব্যাঘাত মনে বিরক্তির জন্ম দেয়।
- উত্তম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে তার অর্থ-সম্পদকে নিরাপদ রাখবে।

---

[২৭৯] ইয়েমেনের একটি গোত্র।

- সুপরিকল্পনার মাধ্যমে তার সন্তান-সন্ততি এবং কাজের লোকদের প্রতি যত্নবান থাকবে।
- তার কোনো নির্দেশ অমান্য করবে না। কারণ, তার নির্দেশ অমান্য করার অর্থই হলো তার মনকে চটিয়ে দেওয়া।
- তার কোনো গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করে দেবে না। যদি তা করো, তা হলে তুমি তার প্রতিশোধ থেকে নিরাপদ থাকবে না।
- তার বিষণ্ণতার সময় আনন্দ প্রকাশ করবে না। আবার তার আনন্দের সময় বিষণ্ণতা প্রকাশ করবে না। কারণ, এতে তার মনে ঘৃণার জন্ম হবে।

মনে রাখবে, তুমি তাকে যত বেশি খুশি করবে, সে তোমাকে তত বেশি ভালোবাসবে। আরও মনে রাখবে, তাকে দিয়ে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নিজের পছন্দ-অপছন্দের ওপর তার পছন্দ-অপছন্দকে প্রাধান্য না দেবে।”[২৮০]

[২৮০] বর্ণনাটি আল-আসবাহানি-এর লেখা 'আল-আঘানি'-তে সংকলিত হয়েছে [তুহ্ফাতুল 'আরুস (পৃষ্ঠা ৯১-৯২) গ্রন্থেও আংশিকভাবে সংকলিত হয়েছে]

শেষ কথা

প্রতিটি মুসলিম নরনারীর উচিত আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্য করার মাধ্যমে একজন আদর্শ এবং উত্তম স্বামী-স্ত্রীর বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জনের চেষ্টা করা। আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যই হলো জান্নাতে যাওয়ার সুনিশ্চিত পথ। অধিকন্তু, এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে নরনারীর দাম্পত্য-জীবন হবে সুখময়। প্রতিটি মুসলিম নরনারীর প্রতি সর্বোত্তম উপদেশ হলো, তারা যেন অমুসলিমদের জীবনাদর্শকে বর্জন করে চলে। অমুসলিমদের পরিবারগুলো ধর্মীয় অনুশাসনের বদলে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। নারী এবং পুরুষের মাঝে যে মৌলিক পার্থক্যগুলো আছে সেগুলোকে তারা গ্রাহ্য না করে সমস্ত ক্ষেত্রেই তারা পরস্পরকে সমান বিবেচনা করে। পরিণামে তারা উপহার পেয়েছে অসংখ্য ভেঙে যাওয়া পরিবার আর বিপর্যস্ত পারিবারিক সম্পর্ক।

ইসলামে নারী এবং পুরুষের রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা। তুলনামূলকভাবে বেশি কষ্টসাধ্য বাহ্যিক দায়িত্বগুলো পুরুষের ওপর অর্পিত। আবার সংসারের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম থেকে শুরু করে সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ণধার সন্তান-সন্ততিদের বড় করে তোলার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা পুরুষের চেয়ে বেশি। কাজেই, স্বামীর চাইতে স্ত্রীকেই সন্তান-সন্ততির পেছনে অধিক সময় দিতে হবে।

পরিবার যদি আল্লাহর নির্দেশিত হুকুম-আহ্কামের ভিত্তির ওপর গড়ে না ওঠে, তা হলে নিশ্চিতভাবে সংসারে দুঃখ-দুর্দশা, অকল্যাণ, ঘৃণা, মতবিরোধ আর নৈরাজ্য বিরাজ করবে।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ওই দাম্পত্য-জীবনকে বরকতময় করে দেবেন, যেখানে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ও তাঁর আনুগত্যে জীবন যাপন করে এবং পরস্পরের প্রতি নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো সঠিকভাবে পালন করে চলে।

কর্মজীবনে নিজেকে উপযুক্ত করে তোলার জন্য আমরা কত লেখা-পড়া করি, দেশ-বিদেশে কত কোর্স কত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। সে তুলনায় দাম্পত্য জীবনকে আমরা যেন মূল্যায়নই করি না। অথচ কর্ম জীবনের চেয়ে দাম্পত্য জীবন আমাদের সামগ্রিক জীবনে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আপনি চান কিংবা না চান এটা আপনার প্রতিটি সকাল, প্রতিটি সন্ধ্যা, প্রতিটি রাতকে প্রভাবিত করবে। আপনার জীবনে সফলতা ব্যর্থতার গতিপথ নির্ধারণে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখবে।

তাই এই পথে যারা যাত্রা শুরু করেননি তাদের যেমন এ বিষয়ে জ্ঞান প্রয়োজন, যারা পথ চলতে চলতে ক্লান্ত; কিংবা যারা ক্লান্ত হতে চান না তাদের সকলের জন্যই 'ভালোবাসার চাদর'। নিজেকে জড়িয়ে রাখুন; সঙ্গীকেও।